উপনিষদ – সপ্তম অধ্যায়

সুকুমারী ভট্টাচার্য

উপনিষদ

বৈদিক সাহিত্যের শেষতম অংশ হ'ল উপনিষদ; আরণক্যের সঙ্গে একত্রে এটি জ্ঞানকাণ্ডরূপে পরিচিত। পরবর্তী ভাষ্যকারীরা 'উপনিষদ' শব্দটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তবুও এর ব্যুৎপত্তিগত মৌলিক অর্থ ছিল গুরুর নিকটে উপবেশন করে। অজিত জ্ঞান। তবে সমালোচকদের মতে ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা ইতিহাস বা ভাষাতত্ত্ব অনুমোদিত নয়। উপনিষদ নামধারী বহু রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও এদের অতি ক্ষুদ্র অংশই যথার্থ উপনিষদ। বৃহৎ উপনিষদ-সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে দ্বিবিধ–বৈদিক ও অবৈদিক; কেবল বৈদিক উপনিষদগুলিই স্বভাবত আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই চৌদ্দটি উপনিষদ পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছিল; এগুলি হল : ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড(ক), মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি, শ্বেতাশ্বতর, মৈত্রায়ণীয় ও মহানারায়ণীয়। এদের নির্দিষ্ট রচনাকাল নির্ণয় করা খুবই দুরহ; আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এদের রচনাকালের উচ্চতম ও নিম্নতম সীমা যথাক্রমে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও চতুর্থ শতাব্দী; সুতরাং এই চৌদ্দটি উপনিষদের মধ্যে কয়েকটি প্রাক-বুদ্ধ এবং কয়েকটি বুদ্ধোত্তর যুগে রচিত।

বিষয়বস্তু (উপনিষদ)

গবেষকরা মনে করেন যে, দীর্ঘতম দুটি উপনিষদই প্রাচীনতম, ব্যাপকতম এবং সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং উভয়ই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নিরবিচ্ছিন্ন ধারারূপে গদ্যে রচিত; এরা হল বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য। শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকে প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনটি প্রাথমিক আরণ্যক বৈশিষ্ট্যযুক্ত অধ্যায় রয়েছে; এর দুটি উপনিষদ-ধর্মীয় অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়কে যথার্থ উপনিষদের উপাদানযুক্তরূপে গ্রহণ করা যায়। প্রথম অধ্যায় প্রাণ, মৃত্যু ও পুরুষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে; উপদেশমূলক ক্ষুদ্র আখ্যান ও সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে গার্গ্য ও অজাতশত্রুর সংলাপ। এখানে আমরা যাজ্ঞবল্ক্য ও দধ্যঙঅথর্বণের মতো বিখ্যাত ঋষির সঙ্গে পরিচিত হই; এতে রয়েছে বাণপ্রস্থে উদ্যত যজ্ঞবল্ক্য ও তার জ্ঞানপিপাসু পত্নী মৈত্রেয়ীর সুপরিচিত সংলাপ। তৃতীয় অধ্যায়ে রাজা জনকের সভায় সমবেত দার্শনিকদের সঙ্গে যাজ্ঞবাল্ক্যের ও চতুর্থে জনক ও যাজ্ঞবাল্ক্যের সংলাপ। পঞ্চম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব ও নীতিবিদ্যার মতো জটিলতর বিষয় বর্ণিত। শেষ অধ্যায়ে পাওয়া যায় পরস্পর-অসম্পৃক্ত বিবিধ বিষয়বস্তু। যথার্থ আধ্যাত্মিক বিষয়, যেগুলি উপনিষদের ভাবকেন্দ্র গঠন করেছে, সেগুলি প্রথম ও শেষ দুটি অধ্যায়ে সম্ভবত পূর্বগঠিত রচনার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল।

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন; এখানে প্রকৃত উপনিষদের অংশটি রয়েছে শেষ তিনটি অধ্যায়ের উপসংহারে। প্রথম তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণত ব্রাহ্মণ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত; এতে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি ও তৎসম্পর্কিত মতবাদগুলি আলোচিত হয়েছে; এতে একটি সংক্ষিপ্ত সৃষ্টিতত্ত্বমূলক অংশ ও একটি অধ্যাত্মবাদী বিবরণ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে

আমরা একটি প্রতীকী তাৎপর্যযুক্ত দেবকাহিনী পাই, যাতে সূর্যকে বিশাল মধুচক্র ও পৃথিবীকে বিরাট মঞ্জুষা রূপে বর্ণনা করে সূর্যের উৎস ও উপাসনা আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রৈক্ক, জবাল ও উপকৌশলের প্রতি সত্যকামের উপদেশ বিবৃত। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে জৈবলির আলোচনা; এর সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনুরূপ বিবৃতির নিবিড় সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ছ'জন দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা ব্যক্তি করার পর, উপসংহারে জৈবলি এদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী অংশের সূচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেখানে উপনিষদের মহাবাক্যরূপে পরিচিত ভাবনাটি-"তৎ ত্বম অসি" বা 'তুমি-ই সেই' অভিব্যক্ত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রখ্যাত ঋষিদের অন্যতম আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে গূঢ়বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে অধিকতর অতীন্দ্রিয়বাদী সত্যের উপস্থাপয়িতা। যাজ্ঞবল্ক্য এই আরুণিরই শিষ্য ছিলেন। সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎকুমারের সংলাপে প্রধানত ধ্যানের মনস্তত্ত্ব ও ভূমার কথা আলোচিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে ব্রহ্মোলব্ধি অর্জনের উপায় ও ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে। এক্ষত্রে প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ের বিবিধ বিষয়বস্তুই যেন ক্রমে শেষ তিনটি অধ্যায়ে নিহিত মৌলিক উপনিষদীয় ভাবনায় পরিণতি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে যজুর্বেদের উপনিষদগুলি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; তাই মহাকাব্যগুলি তাদের মধ্য থেকেই সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃতি চয়ণ করেছে।

শুক্ল যদুর্বেদের অন্তর্গত ঈশোপণিষদ এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে ক্ষুদ্রতম; এতে মাত্র আঠারটি শ্লোক রয়েছে। এই রচনায় কর্ম ও জ্ঞানের দ্বৈতবোধকে উন্নততর আধ্যাত্মিকপ্রাপ্তির স্তরে সমন্বিত করার চেষ্টা রয়েছে; সেইসঙ্গে প্রথম আমরা ক্ষুদ্র একটি বর্ণনীয় দার্শনিক স্থৈর্যসম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ স্থিতধীর সাক্ষাৎকার লাভ কবি, পরবর্তীকালে যার ভাবরূপ ভগবদ্গীতায় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল।

সামবেদের কোনোপনিষদে যে চারটি অধ্যায় আছে, তাদের মধ্যে প্রথম দুটি ছন্দে রচিত এবং তাতে সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়াও ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার মৌল প্রেরয়িতারূপে আত্মার ভূমিকা বিবৃত হয়েছে। শেষ অংশটিতে আত্মার জ্ঞানতত্ত্ব রহস্যগূঢ়ভাবে আলোচিত হয়েছে। গদ্যে রচিত শেষ দুটি অধ্যায়ে পরমাত্মা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য দেবতাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বর্ণিত; পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান লাভে পর পর সবকটি দেবতার ব্যর্থতার পর উমা হৈমবতী ঘোষণা করলেন, এই হ'ল ব্রহ্ম।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় উপনিষদে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথমটিতে বিরাজের মাধ্যমে আত্মা থেকে সৃষ্টি ও সেইসঙ্গে সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান এই প্রথমবার বিবৃত; উপনিষদের মৌলিক মতবাদগুলির অন্যতম যে অণুবিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সাযুজ্যবোধ–তা এখানে প্রতিফলিত। সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষের ত্রিবিধ জন্ম-গর্ভাধান, স্বাভাবিক জন্ম ও পুত্রের মধ্যে আত্মসম্প্রসারণে যে জন্ম, তা আলোচিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে আত্মার ইন্দ্রিয়াতীত প্রকৃতি ও বুদ্ধির সঙ্গে তার সম্পর্ক বামদেব ব্যাখ্যা করেছেন।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদেও তিনটি অধ্যায় আছে। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে শুরু হয়ে পরে অতিজাগতিক, জ্যোতির্বিদ্যাগত, বোধিগত, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রায় অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক বিবৃত করেছে। এতে রয়েছে ত্রিশঙ্কুর দুটি নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ বিবৃতি। শেষ অধ্যায়ে বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে ব্রহ্মাকে উপমিত করা হয়েছে; এগুলি হল অন্ন, প্রানবায়ু, মন, জ্ঞান ও আনন্দ; বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে প্রশ্ন। শেষ অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে আরণ্যক ও ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ঋগ্বেদের কৌষীতকি উপনিষদে যে চারটি অধ্যায় রয়েছে, তার মধ্যে প্রথমটিতে পিতৃযান ও দেবযান আলোচিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিবিধ বিষয়গুলির রচয়িতারূপে কৌষীতকি, পৈঙ্গ্য ও শুষ্কভৃঙ্গারের নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে তাতে বহু সমসাময়িক সামাজিক রীতিনীতিও প্রতিফলিত হয়েছে। ঋগ্বেদীয় উপনিষদ ব'লেই কৌষীতকির সঙ্গে ইন্দ্র সম্বন্ধে দেবকাহিনীগুলির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে; ইন্দ্রকে তার পূর্বতন অভিযানের জন্য দম্ভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রকে জানা-ই সর্বোত্তম কল্যাণের কারণ। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণের মহিমা কীর্তিত; শেষ অধ্যায়ে বালাকি-অজাতশত্রুর কাহিনী পুনরাবৃত্ত হয়েছে যা ইতিপূর্বে বৃহদারণ্যকে উপনিষদে কথিত। শেষ অধ্যায়ে স্বপ্নের বিশ্লেষণও গুরুত্ব পেয়েছে, তবে তার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হ'ল প্রেততত্ত্ব, আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, পুনর্জন্মবাদ।

কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর অর্বাচীনতর, পদ্যে গ্রথিত উপনিষদ এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাববস্তুর বিচারে পরস্পরের নিকটবর্তী। এদের মধ্যে কঠোপনিষদের দুটি অধ্যায় আছে, তবে এটা স্পষ্ট যে, মূল বচনাটি তিনটি অংশে বিন্যস্ত প্রথম অধ্যায়েই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে প্রথম অধ্যায়ে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তাই মনে হয় যে, প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যবর্তী অংশ পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল।

অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডক উপনিষদ সম্ভবত কোনো মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা বা তাদের জন্য রচিত হয়েছিল; গদ্যে ও পদ্যে গ্রথিত এই উপনিষদের সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও এতে প্রচুর অতীন্দ্রিয়-প্রবণতা নিহিত রয়েছে। মুণ্ডক এবং কেন–এই উভয় রচনাতেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং সেই সঙ্গে শৈব প্রবণতার অভিব্যক্তি স্পষ্ট। তিনটি অধ্যায়যুক্ত মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত আনুষ্ঠানিক

প্রতীকায়নের প্রবণতা সত্যের বহু প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে অধ্যাত্মবাদে উপনীত হয়েছে। শেষ অধ্যায়টি চরিত্রগত বিচারে অধিকতর অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী এবং তা ব্রহ্মের স্বভাব ও পরম উপলব্ধির জন্য ব্রহ্ম-সান্নিধ্য লাভের উপায় বর্ণনা করেছে।

অথর্ববেদের জন্য একটি উপনিষদ–মাণ্ডুক্য মাত্র বারোটি সংক্ষিপ্ত বিভাগের মধ্যে পরবর্তীকালের বেদান্ত দর্শনের মৌলিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য গ্রথিত গদ্যে এই উপনিষদ ব্রহ্মা সম্পর্কে উপদেশ প্রচার করেছে; অন্তর্বস্তুর বিন্যাসের ক্ষেত্রে রচনাটি অধিকতর নিগূঢ় রহস্যদ্যোতক।

কৃষ্ণ যদুর্বেদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শৈব বিষয়বস্তু লক্ষণীয়; গ্রন্থের দুটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথমটিই সম্ভবত মৌলভাবকেন্দ্রকে ধারণ করেছে, কারণ তাতে কেন্দ্রীয় বাক্যাংশটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে, যা রচনার সমাপ্তিসূচক। এই অধ্যায়ে সমসাময়িক মতবাদগুলি পর্যালোচিত–এমনকি তৎকালীন ক্রমবিবর্তিত আত্মতত্ত্বও এর মধ্যে আছে–কিন্তু বিচারে প্রত্যেকটি মতবাদ যেহেতু অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয়েছে, তাই শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট সাংখ্য-প্রবণতাযুক্ত শৈব মতবাদই এতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এর ঈশ্বরভাবনায় বেদান্তের ব্রহ্মা যেন সাংখ্যের পুরুষের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমীপবর্তী যোগতত্ত্বকে লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়রূপে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগ মতবাদ ব্যাপকতরভাবে বিশ্লেষিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সরূপ ঈশ্বরের অভিব্যক্তিরূপে এমন দেবতাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে যিনি পরবর্তীকালে গুরুবাদ ও ভক্তিবাদ-সংশ্লিষ্ট পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। অবশ্য তখনো পর্যন্ত অস্পষ্ট ধারণার স্তরে বিরাজমান সাংখ্য মতবাদ 'প্রধান'কে বিমূর্ত তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত না করে দেবতারূপেই তুলে ধরেছে; তেমনি প্রারম্ভিক স্তরে বিদ্যমান বেদান্ত দর্শনের 'মায়া' এখানে সাংখ্যে কথিত প্রকৃতিরূপে উপস্থিত।

পুরুষ, প্রকৃতি ও তিনগুণের মতো মৌলিক সাংখ্য উপাদানগুলি এখানে পাওয়া যাচ্ছে; সৃষ্টি ও বিবর্তনরূপে বর্ণিত এবং মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতি সাংখ্য দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় বা মৈত্রী উপনিষদ ব্রাহ্মণ-শৈলীর গদ্যময় বাক্যে রচিত ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ। উপনিষদগুলির মধ্যে অর্বাচীনতম এই রচনাটি সাতটি প্রপাঠকে সম্পূর্ণ, তবে স্পষ্টতই এটি বহিরাগত উপাদানের দ্বারা ক্রমাগত পরিবর্ধিত হয়েছিল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে, যা প্রসঙ্গত সেই যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে। সাংখ্য ও যোগ যেমন প্রধান্য পেয়েছে, তেমনি ত্রয়ী দেবতা-ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাদের ত্রিবিধ গুণ ও তিনটি ভিন্ন ধরনের অতিজাগতিক ক্রিয়াকলাপসহ উপস্থাপিত হয়েছেন। দ্বিতীয় অংশে অর্বাচীনতার লক্ষণ পাওয়া যায়,–জ্যোতির্বিদ্যা প্রণোদিত অনুমান, সূর্যপূজা, সামাজিক নৈতিকতা, হঠযোগ ও যোগ্যভাসের সময়ে ধ্যানরত ব্যক্তি যে সাত প্রকার অতীন্দ্রিয় ধ্বনি শোনেন, তার বর্ণনা ইত্যাদি। স্পষ্টতই এগুলি উপনিষদ বহির্ভূত বিষয়বস্তু, যাদের মধ্যে লোকায়াত ধর্মের ও বিশ্বাসেব নানাবিধ উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে; তখন সর্বজনগ্রাহী ধর্মীয় ভাবনায় এসব ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। সহজেই অনুমান কবা যায় যে, আলোচ্য উপনিষদটি রচিত হওয়ার পিছনে নানাবিধ পূর্বাগত অরক্ষণশীল, অব্রাহ্মণ্য ধর্মমতেব অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ছিল, যদিও রচনায় সেসব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষীণ ও বিশৃঙ্খল প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ফলে আমরা পুঞ্জীভূত পরস্পর অসম্পৃক্ত, পারস্পর্যহীন ও অস্পষ্ট কলেবর একটি রচনা পেয়েছি। মৈত্রায়ণীর উপনিষদের অর্বাচীনতাব প্রমাণ হিসাবে তাব মধ্যে বহু দেবকল্পনার উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়; এদিক দিয়ে তা প্রধান

উপনিষদগুলি অপেক্ষা আস্তিক্যবাদী উপনিষদ অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরের বেশি কাছাকাছি।

কৃষ্ণ-যদুর্বেদের মহানারায়ণীয় বা বৃহন্নারায়ণীয় উপনিষদ প্রকৃতপক্ষে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম অধ্যায়। পদ্যে গ্রথিত ও পাঁচটি অধ্যায় বিনাস্ত এই গ্রন্থ বহু পরবর্তী কালে রচিত। এতে পরবর্তীকালে সৃষ্ট মহাকাব্যিক ছন্দ অনুষ্টুপ-এর একটি অনিয়ন্ত্রিতরূপ এবং মিশ্র উপজাতি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যথার্থ ব্রাহ্মণ্য রীতি অনুযায়ী এ গ্রন্থ সৃষ্টিশীল পরম সত্তারূপে প্রজাপতিকে মহিমান্বিত করে তাঁর সৃষ্টিকে বিবৃত করেছে। দেবসঙ্ঘও এখানে অর্বাচীনতায় প্রমাণ বহন করছে, শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও কার্তিকেয়ার মতো অধিকাংশই অর্বাচীন। মহাকাব্য-পুরাণ-বৃত্তের দেবতা ছাড়াও বিভিন্ন নামে দুর্গাকেও উপস্থাপিত কবেছে এবং ইচ্ছামতো দানব, যক্ষ ও পিশাচদের উল্লেখ করেছে। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে স্ত্রোত্রগুলিব সঙ্গে মহাকাব্য-পুরাণ বৃত্তের বিষয়গুলির যেমন নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে জনপ্রিয় হয়ে-ওঠা যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও এই সাযুজ্য চোখে পড়ে। স্পষ্টতই এই গ্রন্থ সংহিতার সুক্তিগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ইচ্ছামতো পূর্বতন রচনাসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং সবগুলি প্রধান উপনিষদের সঙ্গে এটি পরিচিত। পৌরাণিক রীতি অনুযায়ী ধ্যানের নির্দেশ দিয়ে, যজ্ঞে ক্রটির জন্যে সমাজচ্যুতির দণ্ড বিধান করে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার সুপ্রচুর অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যাখ্যা দিয়ে ও নারায়ণের জন্য যথার্থ পৌরাণিক বিধি অনুযায়ী পূজার ব্যবস্থা করে, গ্রন্থটি পৌরাণিক শাস্ত্রের অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে। এব। সঙ্গে প্রধান উপনিষদসমূহের একটা সাধারণ ব্যবধান রচিত হয়েছে। এর প্রত্নকথা ও উপাখ্যানগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী-চরিত্রযুক্ত হওয়াতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয় যে, শ্বেতাশ্বতর ও মহানারায়ণীর একটি পৃথক শ্রেণীর রচনা; বস্তুত, এদের প্রাচীনতম সাম্প্রদায়িক উপনিষদরূপে গণ্য করা চলে। পরবর্তীকালে এই প্রবণতা অসংখ্য শৈব ও বৈষ্ণব উপনিষদের মধ্যে অব্যাহত

ছিল; এসব যদিও প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলিরই সমসাময়িক, এধরনের গ্রন্থগুলি নিজেদের উপনিষদরূপে পরিচয় দিতে যত্নবান ছিল, কেননা এই নামের সঙ্গে তখনো আধ্যাত্মিক গৌরব সংশ্লিষ্ট ছিল।

মহানারায়ণীয় উপনিষদ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল; তবে শঙ্করাচার্য এই গ্রন্থের কোনো ভাষ্য প্রণয়ন করেন নি। সম্ভবত, নারায়ণভক্তদের জন্য প্রার্থনাপুস্তকরূপে এটি রচিত হয়েছিল ব'লেই নারায়ণের উদ্দেশ্যে বহু সূক্ত এতে নিবেদিত হয়েছে। বৌধায়ন-ধর্মসূত্রেও এই ঐতিহ্য জাগরকে ছিল এবং বৈখানস স্মার্ত সূত্রকে এর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী বলে মনে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এই রচনা নারায়ণীয় চর্যার অস্তিত্বকে প্রতিফলিত করেছে এবং শেষপর্যন্ত বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তু-সম্পন্ন পৃথক একটি ধারার তাৎপর্য অর্জন করে।

অথর্ববেদের অন্তর্গত ও ছ'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত প্রশ্ন উপনিষদে সুপরিকল্পিত রচনা লক্ষ্য করা যায়; ছ'জন ঋষি পিপ্পলাদ ঋবির কাছে ছটি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেসব প্রশ্নের উত্তর এই উপনিষদের অবয়ব নির্মাণ করেছে। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে তৎকালে প্রচলিত দার্শনিক অনুসিন্ধৎসার প্রকৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে।

রচয়িতা (উপনিষদ)

প্রধান উপনিষদগুলির মধ্যে অধিকাংশ যেহেতু সংলাপ-রচনার আঙ্গিকে বিন্যস্ত, তাই কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকেই রচয়িতারূপে ধ'রে নিতে হয়, কারণ লেখক হিসাবে কেউ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নন। এটি অবশ্যই

পদ্ধতি হিসাবে অসন্তোষজনক, কেননা বহু রচনাতে সংলাপমূলক আঙ্গিকের উপস্থিতি নেই— যেমন : ঈশ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়; তাছাড়া কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকে বাস্তব জগতের অধিবাসী নন, দেবলোক থেকে তঁদের সৃষ্টি, যেমন যম, ইন্দ্র, প্রজাপতি। আমরা রচনা থেকে মোটামুটিভাবে যে তথ্য সর্বজনগ্রাহ্যরূপে গ্রহণ করতে পারি, তা হল এই যে, স্রষ্টারূপে যাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে সাধারণত তারা অকৃত্রিম।

প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন প্রাচীন বা শ্রদ্ধেয় বিশেজ্ঞদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, যাঁদের অবদানেই সম্ভবত নব্য ভাবধারা গড়ে উঠেছিল। তবে, সর্বাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির নাম হল যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি বৃহদারণ্যকের আধ্যাত্মিক ভাবকেন্দ্র রচনা করা ছাড়াও অন্য একটি ভাবধারার প্রথম প্রবক্তা হয়েছিলেন–পরবর্তীকালে যা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত হ'ল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নামগুলি হল শাণ্ডিল্য–বিখ্যাত 'তজ্জলান' তত্ত্বের প্রবক্তা, দধ্যঙ্–মধুবিদ্যার প্রণেতা এবং আরুণি, মনস্তত্ত্ব এবং নাম ও পদার্থতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ। উপনিষদের মতবাদগুলির প্রবক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি–তাঁরা অরণ্যেই থাকুন বা গৃহবাসীই হাে্ন বা রাজা জনকের মতো প্রাসাদনিবাসী হাে্ন, এই মর্যাদালাভে তাঁদের কোনো বাধা ছিল না।

আঙ্গিক ও ভাষা (উপনিষদ)

প্রাচীনতম গদ্য উপনিষদগুলিতে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অনুরূপ গদ্য যেমন প্রধান আঙ্গিক, তেমনি পদ্যে রচিত উপনিষদগুলির রচনাশৈলীতে আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যসমূহের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। এদের মধ্যে মৌখিক সাহিত্যের বহু

বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যদিও অর্বাচীনতম উপনিষদগুলি রচিত হবার পূর্বেই সম্ভবত লেখন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, অনুমান করা যেতে পারে। ধর্মীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সম্ভবত লেখা তখনো প্রযুক্ত হয় নি, যেহেতু ঐ সব রচনা শ্রুতিকাব্যরূপে প্রণীত ও মৌখিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হচ্ছিল। তাই, গদ্য ও পদ্য উভয়ের মৌল চরিত্রলক্ষণ ছিল সংক্ষিপ্ততা ও ঋজুতা; এমন কি সংলাপাত্মক, বর্ণনাত্মক অংশেও নির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ রচনাগঠনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ধ্রুবপদ এবং বাক্যাংশ ও বিশিষ্টার্থক পদ, এমন কি সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগে যে ধরনের পুনরাবৃত্তি মৌখিক সাহিত্যে স্মৃতিসহায়করূপে গণ্য হয়,–সেসব উপনিষদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোনো বাক্যাংশে শুভসূচক বা সুখপ্রদ বলে পরিগণিত হলে বহুবার তা পুনরাবৃত্ত হয়ে থাকে। স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য যেহেতু সর্বাধিক সংক্ষিপ্ততা আবশ্যিক, বর্ণনাংশেও তেমনি চূড়ান্ত বাচনিক সংযম দেখা যায়। কিছু কিছু বাক্য অত্যন্ত দুর্বোধ্য, তবে সাধারণভাবে রচনাশৈলী ব্রাহ্মণানুগ এবং একই ধরনের বাচনিক সংযম এখানে রয়েছে। কখনো কখনো এই চুড়ান্ত সংক্ষিপ্ততার ফলে অভিপ্রেত অর্থ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়, কারণ সংযোগকারী শব্দ বা বাক্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। তবে কখনো কখনো নিগূঢ় রহস্যবাদী প্রবণতার ফলে 'তজ্জলান্'-এর মতো বাক্যাংশে তির্যক তাৎপর্য যুক্ত হয়; অতীন্দ্রিয়বাদী উপাদান সংরক্ষিত করার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র সংকেতসূত্র জাতীয় অভিব্যক্তি [যেমন তত্তমসি, সোহহম্, অতোহনাদার্তম্] তাদের সুপরিমিত আঙ্গিক ও প্রসঙ্গের গভীরতার মধ্য দিয়ে হীবক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

গদ্যস্তবকগুলি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে বিভক্ত হওয়ায় সহজে স্মৃতিতে ধারণের উপযুক্ত ছিল। গদ্যের ব্যাকরণ ও শৈলী পতঞ্জলির সমীপাবতী—যিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম

সহস্রাব্দের শেষ শতাব্দীগুলিতে সংক্ষিপ্ত ও সাব্যগর্ভ গদ্যশৈলী সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দীতে কোনো প্রধান পরিবর্তন ছাড়ই তা নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান ছিল। যতিসমূহ ব্যাকরণগত বা প্রবন্ধগঠনগতভাবে নির্ধারিত নয়; নিতান্তই শ্বাসাঘাতজনিত যতি, যা মৌখিক সাহিত্যের একটি আবশ্যিক লক্ষণ। মৌখিক সাহিত্যের অন্য লক্ষণ দেখা যায় বিষয়বস্তুর আকস্মিক পরিবর্তনে, আমরা যদি মনে রাখি যে, রচনার অন্তবর্তী ফাঁকগুলি মৌখিকভাবে উপযুক্ত ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গি ও শব্দদ্বারা আচার্য র্তাব শিক্ষাদানের সময় পূরণ করে নিতেন, তাহলে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র রচনার স্মরণীয় অংশটুকুই সংরক্ষিত হত। একইভাবে ভৃগু ও বরুণের সংলাপে প্রশ্নকর্তাকে পূর্বনির্ধারিত সংকেতসূত্র দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে জ্ঞানের জন্য পুত্রের সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে—এতেও মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট। সাধারণভাবে উপনিষদগুলি স্বরযুক্ত নয়।

বহু উপনিষদে সংলাপ-আঙ্গিকে রচিত দীর্ঘ অংশ রয়েছে। উপনিষদের মধ্যে এগুলিকে চমৎকার 'জীবন্ত' আঙ্গিকরূপে গ্রহণ করা যায়, কারণ এগুলি প্লেটোর বিখ্যাত সংলাপশৈলীর ধরনে জিজ্ঞাসু ও প্রবক্তাদের মধ্যে সংঘটিত প্রকৃত সংলাপগুলিকে রক্ষা করেছে। এই আচার্যরা ছিলেন তাদের সময়ের অগ্রগামী চিন্তাবিদ। বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হত এবং প্রবীণ আচার্য বা ঋষি সেসবের উত্তর দিতেন। এধরনের প্রশ্নোত্তরমূলক দ্বান্দ্বিক রচনাশৈলীর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় প্রশ্নোপনিষদে; খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে প্রচলিত দ্বন্দ্বমূলক আধ্যাত্মিক ভাবনার দিকপরিবর্তন এতে সূচিত হয়েছে। অদ্বন্দ্বমূলক কথকতাধর্মী আলোচনায় সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ রচনাশৈলী অনুসৃত হত, সাধারণত সমাজে ভাসমান জ্ঞানগর্ভ শ্লোকভাণ্ডারের উত্তরাধিকার থেকে লব্ধ নীতিমূলক রচনা কখনো কখনো প্রাগুক্ত শৈলীতে ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে এদের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পর্কে আশ্চর্য সজীব

অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী প্রায়ই যেভাবে গুরুর কাছে অন্তর্দৃষ্টি উদ্ভাসনের আবেদন জানিয়েছে, আচার্যের উত্তরে সংকেতসূত্রের রূপে নিবদ্ধ তত্ত্বগুলি তৎকালীন জ্ঞানতৃষ্ণার ঐকান্তিকতা প্রমাণ করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ শ্লোকসমষ্টি উপস্থাপনার পূর্বে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ভূমিকারূপে কিছু গদ্য স্তবকের পুনরাবৃত্তি করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন : ২ : ৫ ১৬-১৯) সংহিতার শব্দভাণ্ডার এ ব্যাকরণরীতি যখন অনুসৃত হয়েছে, তাকে প্রাচীনতর রচনারূপে গ্রহণ করা যায়; আবার, কোথাও সমসাময়িক অর্থাৎ উপনিষদযুগের ভাষা প্রয়োগের লক্ষণ স্পষ্ট। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার বহু পারিভাষিক শব্দ অর্বাচীনতর উপনিষদগুলিতেই প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল।

উপনিষদ যুগেব বৈদিক ভাষায় নিজস্ব কোনো ব্যাকরণ যদিও ছিল না, তবুও আমরা প্রাচীনতর বৈদিক পর্যায় থেকে মহাকাব্যযুগের দিকে ব্যাকরণগত বিবর্তনের আভাস এখানে লক্ষ্য করি। শব্দরূপ, উপসর্গ, ক্রিয়াপদ, ছন্দ ইত্যাদির প্রয়োগে প্রাচীন ও নবীনের সহাবস্থান চোখে পড়ে। উপনিষদ রচনার শেষ পর্বে উদ্ভূত অন্যান্য চরিত্রলক্ষণ হ'ল, গ্রন্থশেষে–'মাহাত্ম্য' অংশগুলি, যাতে আছে–রচনা-পাঠ ও শ্রবণের ফলশ্রুতির বর্ণনা। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের শেষে ও গ্রন্থের উপসংহারে এবং শ্বেতাশ্বতরে গ্রন্থশেষে এধরনের অংশ পাওয়া যায়। বহু উপনিষদের সূচনায় ও সমাপ্তিতে পূর্বনির্ধারিত সংকেতসূত্র জাতীয় প্রসস্তিমূলক অংশগুলিতে কখনো কখনো জিজ্ঞাসুদের প্রার্থনাপূরণের আকাঙ্খা অভিব্যক্ত হয়েছে। এগুলি মাঝে মাঝে সংহিতা বা ব্রাহ্মণ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এটি যে পরবর্তীকালে উদ্ভূত রীতি, তার প্রমাণ হ'ল, প্রাচীনতম দুটি উপনিষদে এটি অনুপস্থিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি গুরু ও শিষ্যের তালিকা এবং বৃহদারণ্যকে একটি বংশতালিকা পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে দার্শনিক রচনা হলেও উপনিষদগুলিতে নিছক মতবাদ ছাড়াও অনেক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সারবস্তু

নিহিত রয়েছে! ব্রাহ্মণগুলির মতো উপনিষদেও কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি, গুরু-শিষ্য, তালিকা, বংশতালিকা, অনুষ্ঠানসমূহের পুনর্বিশ্লেষণ এবং অসংখ্য উপকথা, কাহিনী ও কিংবদন্তী পাওয়া যায়। এসব কাহিনীর মাধ্যমে আমরা তৎকালীন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রধান বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা থাকায়, এদের মধ্যে সমাজ, রীতিনীতি, ব্যবহারবিধি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নির্ভরযোগ্য একটি চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থা (উপনিষদ)

বৈদিকযুগের সৃষ্টিশীল রচনাপর্যায়ের পরিসমাপ্তি সূচনা করে যে উপনিষদ সাহিত্য, তাতে বৈদিক মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে গবেষক ও আচার্যদের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী দীর্ঘ পরম্পরার ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বহু উপনিষদে প্রাচীন বিশেষজ্ঞ, ঋষি ও আচার্যরা উদ্ধৃত হয়েছেন এবং দ্বিবিধ বিদ্যা অর্থাৎ পরা ও অপরা বিদ্যার প্রবক্তা আচার্য ও চিন্তাবিদদের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। চতুর্বেদ অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত; লক্ষণীয় যে, অথর্ববেদ ইতোমধ্যে শাস্ত্ররূপে স্বীকৃত হয়ে গেছে। অপরা বিদ্যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষী (মণ্ডুক ১ : ১ : ৫, বৃহদারণ্যক ২ : ৪ : ১০); এছাড়া, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষদ, শ্লোক, ভাষ্য-সাহিত্য ও ভেষজবিদ্যা। এসব জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যরূপে আরও পূর্ব থেকে বর্তমান ছিল।

প্রথম দিকে বেদাধ্যয়ন তিনটি আর্যবর্ণের পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ছিল। অবশ্য শাস্ত্রগুলির দ্রুত বিস্তারের পরে সমগ্র বেদের জ্ঞান অর্জনের থেকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অব্যাহতি দেওয়া হল; যে কোনো বেদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করা তাদের

অধ্যয়ন করতে হত। কালক্রমে প্রয়োজনের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে এল, হয়তো বা ক্রমবর্ধমান বৈদিক সাহিত্যও পরিমাণে এত বিপুল কলেবর হ'ল যে, একজনের পক্ষে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত তা গায়ত্রী শ্লোকের তিনটি ক্ষুদ্র চরণ জানার মতো অবিশ্বাস্য ন্যূনতম প্রয়োজনে পর্যবসিত হ'ল। এমন কি, উপনিষদের যুগেও কোনো কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারে যে বেদাধ্যয়নের প্রতি অবহেলা দেখানো হত, তা ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি অংশে (৬ : ১ : ১) স্পষ্ট। সেখানে শ্বেতকেতুকে তাঁর পিতা বেদাধ্যয়নের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, তাদের পরিবারে বেদজ্ঞানবিবর্জিত 'ব্রহ্মবন্ধু'র কোনো অস্তিত্ব নেই। বিখ্যাত বিদ্বান ব্রাহ্মণরা বাস্তবজীবনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তাই, একটি সাধারণ শব্দবন্ধ পাওয়া যায়, 'মহাকাল মহাশ্রোত্রিয়'। প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী উপনয়নের পরে কিশোর বিদ্যার্থী কয়েক বছরের জন্য গুরুর আশ্রমে যেত; গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে সে বিবাহ করে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত। বলা, বাহুল্য, কয়েক শতাব্দী ধরে সঞ্চিত বিদ্যাকে, সেই অক্ষরজ্ঞান আবিষ্কৃত হবার পূর্ববর্তী দিনগুলিতে, সংরক্ষিত করার একমাত্র উপায়ই ছিল সমগ্র রচনা কন্ঠস্থ করে। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই বিদ্যার উৎস সম্ভবত ইন্দোইয়োরোপীয়দের মূল বাসভূমি থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে লেখন-পদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হ'ল, তখন সংরক্ষণের অন্য উপায় দেখা গেল। ভিন্ন ভিন্ন পরিবার ভিন্ন ভিন্ন বেদ–এমন কি তাদের পৃথক পৃথক শাখাগুলিও সংরক্ষণ করত; ফলে, কোনো একটি ব্যক্তির স্মরণশক্তির উপর চাপ কমে গিয়েছিল। তবে, সমস্ত যুগেই এমন কিছু পরিবার ছিল, যারা চতুর্বেদ আয়ত্ত করত। শাস্ত্রসমূহে সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, ক্রিয়াকলাপ, মূল্যবোধ-সামগ্রিক

জীবনযাপন প্রণালী সংরক্ষিত হয়েছিল। জনসাধারণের স্মৃতিতে নিবদ্ধ হওয়া ছাড়াও এসব শাস্ত্র সমগ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে সমন্বয় বিধানের একটি উপাদান হয়ে উঠেছিল; ততদিনে অসংখ্য বৈচিত্রসহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক রচনারীপে এগুলি বিপুল অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

অঙ্গীকারবদ্ধ যজ্ঞগুলিতে বৈদিক সাহিত্য আবৃত্তির প্রচলিত ঐতিহ্য থেকেই সম্ভবত এই ধরনের ধারণার উৎপত্তি। তাই, বৃহদারণ্যকে উপনিষদের অন্তিম অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে বিভিন্ন রূপ ও গুণ সমন্বিত সন্তান লাভের জন্য অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন বেদের সম্পূর্ণ বা আংশিক আবৃত্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

আর্থনীতিক জীবন (উপনিষদ)

বিদ্যালাভের বিপুল আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ব্যাপারেও আর্যরা সমান আগ্রহী ছিলেন; খাদ্য বা অন্নের প্রতি তারা শুধু প্রবলভাবে মনোযোগী-ই ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে অন্ন যেন এখানে (যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩ : ৭-১০) পূজাই পেয়েছে। ঐতরেয় উপনিষদে (১ : ৩ ১-১০) বলা হয়েছে যে, মানুষ ও পশুর সৃষ্টির পরে বিশ্বস্রষ্টা খাদ্যসৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির পরে অন্ন মানুষের আয়ত্তাধীন রইল না। বাক ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানুষ তাকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বায়ুর সাহায্যে মানুষ অন্নকে অধিকার করতে পারল। এই সহজ প্রত্নকথার মধ্যে অন্ন উৎপাদনে আদিম মানুষের সমস্যা আভাসিত হয়েছে। খাদ্যসংগ্রহ ও শিকারের স্তরে যে তীব্র অনিশ্চয়তাবোধ আদিম মানুষকে পীড়িত করত, কিংবা কৃষিজীবী মানুষ যে খরা ও শস্যহানির ফলে খাদ্যবিরলতা ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ত্রস্ত হ'ত, সে-সব যৌথ অবচেতনায় নিয়ত জাগরকে ছিল বলে

প্রত্নকথার মধ্যে তা এভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। দ্রুত অন্নবৃদ্ধিই তাই কাম্য এবং অন্ন তাই সর্বজনপূজ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (১ : ১৯) পঙ্গপাল-জনিত দুর্ভিক্ষের চিত্র খুজে পাওয়া যায়, যখন এক ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তির নিকট সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ খাদ্য ভিক্ষা করছে। সেই ব্যক্তিই পরে রাজকীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে দরকষাকষির মাধ্যমে কোনো দায়িত্বভার গ্রহণ করে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে অন্নের গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিল। সহৃদয় রাজা জনশ্রুতি পৌত্রায়ণ সর্বসাধারণের জন্য বহু অন্নসত্র নির্মাণ করে নিঃস্ব ব্যক্তিদের মধ্যে অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্নবিতরণ তখন পুণ্যপ্রসু ও খ্যাতিলাভের উপায়রূপে বিবেচিত হ'ত। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার (অশনায়া-পিপাসার) বিপুল ভয়কে বার বার প্রধান শত্রুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতরেয় উপনিষদ (১ : ২) অনুযায়ী মানবদেহে অবস্থানকারী ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে দেবতার মতো প্রসন্ন করতে হয়।

পারিবারিক চিত্র (উপনিষদ)

সম্ভবত উপনিষদের যুগেও পারিবারিক কাঠামো একান্নাবর্তী বা প্রসারিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক অটুট ছিল। সন্তানের প্রতি স্নেহ ও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধার প্রশংসা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশিবার নারীর প্রতি উচ্চারিত আশীর্বাণী হ'ল : 'এই নারী কখনো পুত্রের মৃত্যুতে রোদন করে না।' নিজ বংশকে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত রাখা আবশ্যিক দায়িত্বরূপে গণ্য হ'ত; দীর্ঘ বংশতালিকাগুলি এই মানসতার প্রমাণ বহন করে। মরণোন্মুখ পিতা তাঁর সমস্ত গুণাবলী, কীর্তি ও শরীর-মনের সব শক্তি পুত্রকে অর্পণ করে বংশকে অবিচ্ছিন্ন রেখে যাবার ব্যবস্থা করেন।

পরিবারে নারীর স্থান পুরুষের তুলনায় হীন; বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬ : ৪ : ২) দেখি যে, এই হীনতার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য পরিকল্পিত, একটি প্রত্নকথার দাবি করা হয়েছে, স্রষ্টাই স্বয়ং নারীকে পুরুষের অপেক্ষা হীনতর অবস্থানে স্থাপিত করেছেন। অবশ্য ব্যতিক্রমী পরিপ্রেক্ষিতে নারীকে কখনো কখনো আধ্যাত্মিক আলোচনায় যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হ'ত। তাই, গার্গী বিখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু গার্গীর সূক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করে ঋষি তাকে শিরশেছদের ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করলেন (বৃহদারণ্যক ৩ : ৬ : ১)। যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, কারণ তিনি ধনসম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যেই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করতে হলে উপনয়ন ও বেদজ্ঞান ছিল আবশ্যিক, কিন্তু এই উভয় অধিকার থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে নারীকে বঞ্চিত করা হত; কারণ, কখনো কখনো আর্যের পত্নী ছিল অনার্য-কন্যা অর্থাৎ সামাজিক বিচারে হীনতার, উপনয়ন ও বেদবিদ্যায় যে অনধিকারিণী। অনার্য নারীর গর্ভজাত পুত্র অবশ্য পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত; ফলত, উপনয়ন লাভ করে যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারী হতে তার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। উপনিষদে যজ্ঞানুষ্ঠান যেহেতু নূতন ধরনের অনুষ্ঠান-বর্জিত একটি বিমূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছে, তাই নারীকে তার থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু সাধারণভাবে নারী ব্রহ্মচর্চায় যোগ দিতে পারত না, গাগী ও মৈত্রেয়ী সর্বতোভাবেই ছিলেন ব্যতিক্রম। আর্য মাতা ও অনার্য পিতার পুত্ররা সম্ভবত মাতৃগোষ্ঠীর নাম বা পদবী লাভ করতেন (যেমন জাবাল)।

পত্নীরূপে নারী সম্পূর্ণ স্বামীর অধীন ছিল, পুরুষ তাকে শয্যাসঙ্গিনী করার জন্য নানাবিধ দান উৎকোচ রূপে অর্পণ করত। কোনো নারী অস্বীকার করলে তাকে লাঠি দিয়েও প্রহারের বিধান দিয়েছেন যাজ্ঞবল্ক্য। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬ : ৪ : ৭) নারীকে দমন ও উপভোগ করার নানাবিধ উপায়ের কথাই এখানে আছে।

নীতিবোধ (উপনিষদ)

ভারতবর্ষে নীতিশাস্ত্রকে কখনো পৃথক চর্চার শাস্ত্ররূপে গণ্য করা হয় নি; প্রচলিত ধর্মীয় ভাবনার অন্তর্লীন ধারারূপেই তার অস্তিত্ব স্বীকৃত। যজ্ঞ যতদিন পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য ধর্ম ছিল, যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজনকেই সৎকর্মরূপে গ্রহণ করা হত। সামাজিক ব্যবহাবের ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে জনসাধারণের নিজস্ব ধারণা নিশ্চিত ছিল, যদিও বিশেষভাবে যজ্ঞের আলোচনায় পূর্ণ শাস্ত্রসমূহে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতির মানদণ্ড তৈরি হয় নি। কিন্তু কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কে মনোযোগ যত শিথিল হ'ল এবং বহুজাতিক এ সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, ততই সামাজিক ব্যবহার বিধি অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করল। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের পরিধিতে একমাত্র উপনিষদেই নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে প্রথম (?) একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি বিখ্যাত অংশে (১ : ১১ – ১-৪) আমরা যে সুস্পষ্ট নৈতিক ভাবাদর্শের সম্মুখীন হই, তা প্রকৃতপক্ষে কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবনারই অভিব্যক্তি এবং অনেকাংশে অভিনব। এতে সত্য ও ধর্ম-এই দুটি মৌলিক তত্ত্বের উপর সম্পূর্ণ নুতনভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের উপসংহারে বৈদিক আর্যজীবনের আদর্শটি উপস্থাপিত হয়েছে (৮ : ১৫ : ১)। এতে কৌতুহলজনক দিকটি হ'ল, পুনর্জন্ম নিবৃত্তির সঙ্গে এই আদর্শটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিদ্যা, আচরণ ও সৎকর্ম সামাজিক মূল্যবোধের অঙ্গ; আবার এগুলি পিতৃলোক ও দেবলোক অর্জন করারও উপায় (বৃহদারণাক ১ : ৪ : ১৬ : ১০ : ৩ ও ছান্দোগ্য ৫ : ১০ : ২) উপনিষদে পিতৃযান ও দেবযানের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে গ্রাম ও অরণ্যের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব ছাড়াও দ্বিবিধ লক্ষ্য, দ্বিবিধ পথ ও দ্বিবিধ গন্তব্যের মধ্যে বিরোধ আভাসিত হয়েছে। পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বও এই পর্বে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে (বৃহদারণ্যক ৩ : ২ : ১৩; কঠ ১ : ২ : ১) সত্য ও ধর্ম এখন একার্থিবহ ও অলঙ্ঘনীয়।

কর্ম, তপ, আত্মসংযম, সত্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি নবোদ্ভূত ভাবাদর্শগুলি এই যুগে অবশ্য পালনীয় সামাজিক মূল্যবোধরাপে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছে (কেন ৪ : ৮ : ৭; মুণ্ডক ৩ : ১ : ৭)। পার্থিব সম্পদ সম্পর্কে নিরাসক্তি, জীবনের প্রতি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গির সূচক হয়ে উঠেছে (ঈশ : ১)। কর্ম যেহেতু দোষাবহ ব'লে গণ্য, আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা তাই কাম্য; নিষ্কাম কর্মী তাই শতায়ু হয়, এই বিশ্বাস জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একটি প্রত্নকথায় দেবতা, মানুষ ও অসুরের মধ্যে নিহিত ব্যবধান ত্রিবিধ সামাজিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শিত হয়েছে (বৃহদারণ্যক ৫ : ৪ : ৫)। কিন্তু এতে যজ্ঞকেন্দ্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত অহিংসা, উদারতা ও দয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে মনে হয়, নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণবিধি মূলত সন্ন্যাসী

সম্প্রদায়গুলিরই সৃষ্টি; এই ধারায় বহু চিন্তাবিদ মনীষী ও দার্শনিকের সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (উপনিষদ)

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে বর্ণভেদ ক্রমশ শিলীভুত হয়ে যাচ্ছিল; যথাযথ শ্রেণীর উৎপত্তি হয়তো তখনো হয় নি, কিন্তু নিঃসন্দেহে সমাজ দৃঢ়পদে সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। লোহার স্বল্পতা এবং উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী, মুদ্রাব্যবস্থা ও পূর্ণবিকশিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্থানের পক্ষে সহায়ক সামাজিক-রাজনীতিক গঠন-সংস্থানের অভাব, এ-সমস্তই অর্ধ-কৌম ও প্রাকমুদ্রা সমাজব্যবস্থার চরিত্রলক্ষণ; খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে সেসমাজের কৃষিকার্যে লোহার স্বল্প পরিমাণ প্রয়োগ করা হত। মৌলিক পরিবর্তনের দিকে প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল বটে, কিন্তু তখনো তা সম্পূর্ণতা পায় নি। বিশেজ্ঞদের অভিমত এই যে, এ-সময় লোহা ব্যবহারের দ্বিতীয় পর্যায় চলছিল; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বিহারে যখন কুটীরশিল্প ও কৃষিকার্যে তার প্রয়োগ শুরু হ'ল কারিগর ও কৃষি-শ্রমিকের শ্রেণী সামাজিক ও বৃত্তিগতভাবে পুরোহিত ও যোদ্ধা শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সামাজিক অক্ষমতা ও অর্থনৈতিক দায়ের ভারে জনসাধারণ পিষ্ট হ'ত; একদিকে নির্দিষ্ট সৈন্যবাহিনী ও অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রেণী-নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখা হ'ত– প্রশাসন রাজস্ব আদায় করত এবং পরিবার, সম্পত্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলার বিধি-লঙ্ঘনকারীর শাস্তি বিধান করত।

উপনিষদ সম্পর্কে অন্যতম প্রধান বিতর্ক এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে : ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কার বেশি প্রাধান্য। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ–যাজ্ঞবল্ক্য আবার তাঁদের মধ্যেও অগ্রগণ্য, যেহেতু উপনিষদের মৌল ভাবাদর্শ তিনিই শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে দীর্ঘতম ও সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ উপনিষদেরই তিনি রচয়িতা। আবার এই সঙ্গে এও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ক্ষত্রিয়রা বিশেষত রাজন্য ও রাজারা, নুতন জ্ঞান বিধিবদ্ধ ও চতুর্দিকে তা প্রচার করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; এমন কি, উপনিষদে কখনো কখনো এও শোনা গেছে যে তারা নবলব্ধ জ্ঞানকে গোপন রহস্যরূপে সতর্কভাবে নিজের শ্রেণীর মধ্যেই একান্তভাবে রক্ষা করতে চাইছেন, অক্ষত্রিয়দের কাছে জ্ঞান-বিস্তারে তারা নিতান্ত অনিচ্ছুক। অবশ্য ব্রাহ্মণ যুগেই এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের আভাস আমরা পেয়েছিলাম (যেমন, কৌষীতকি ২৬ : ৫; শতপথ, ১১; ঐতরেয় ২ : ১৯)।

আরুণি যখন রাজা প্রবহণ জৈবলিকে এই নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান দানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন রাজা দ্ব্যর্থহীনভাবে তাকে জানিয়েছিলেন, এই বিদ্যা আরুণিই ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথম লাভ করছেন (ছান্দোগ্য ৪ : ৩ : ৭)। পাঁচজন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব উদালক আরুণির কাছে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের জন্য গিয়েছিলেন; কিন্তু নিজের অপর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে আরুণি তাদের ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতির নিকট নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ চিন্তাবিদরূপে ক্ষত্রিয় অশ্বপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ আরুণির তুলনায় অগ্রণী (ছান্দোগ্য ৫ : ১১)।

রাজন্যরূপে তৎকালীন উন্নতিশীল ভূপতিদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের নিবিড় সম্পর্ক ছিল; তাঁরা হয় রাজাদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন, নয়ত তাঁরা ছিলেন রাজসভা বা রাজপরিষদের অন্যতম সদস্য। অহংকারী ব্রাহ্মণ বালাকির জ্ঞানের গর্ব কিভাবে ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রু চুর্ণ করেছিলেন, বৃহদারণ্যক

উপনিষদে (২ : ১ : ১৫) তার মনোজ্ঞ বিবরণ রয়েছে। আবার, ঐ গ্রন্থে দেখি, পুত্র শ্বেতকেতুর ব্যর্থতার কথা জেনে গৌতম রাজা প্রবহণ জৈবলির কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন (তদেব, ৬ : ২ : ৮)। এসব বৃত্তান্ত থেকে আমাদের মনে হয় যে, অন্তত প্রাথমিক স্তরে তত্ত্বজ্ঞানে ক্ষত্রিয়দের একাধিপত্য ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৃত্তান্তের (৫ : ৩ : ৬ : ৭) কথা আমাদের মনে পড়ে, যেখানে রাজা জনকের বিতর্কসভায় যোগদানে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণদের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়ের কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হতে পারেন।

স্পষ্টত জীবনের বহু ক্ষেত্রে সে-যুগে ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমন এক সময় ক্ষত্রিয়দের ভূমিকা প্রাধান্য অর্জন করেছিল যখন ক্ষমতাশালী রাজারা প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি অধিকারের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাছাড়া, দেশের সীমাতিযায়ী ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল–ভ্রাম্যমান বণিকদের যাত্রাসঙ্গীরূপে একমাত্র বেতনভোগী ক্ষত্রিয় প্রহরীরা সেই নিরাপত্তা বিধানে সমর্থ ছিল। সমাজে ক্ষত্রিয়দের ক্রমোত্থানের ব্যাখ্যা এবং শক্তিবৃদ্ধি করার প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রত্নকথা আবিষ্কৃত হয়েছিল (যেমন বৃহদারণ্যক, ১ : ৪ : ১১)। অবশ্য এই প্রত্নকথায় যেহেতু ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়কে পূজা-মর্যাদাদান কিংবা ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের গর্ভ-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সহাবস্থান ও দ্বন্দ্ব দুয়েরই আভাস পাই। আবার ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের শক্তির উৎস বা চূড়ান্ত আশ্রয় রূপে বর্ণনা করার মধ্যে দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পরবর্তীকালের প্রচেষ্টাও ব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো ভারতবর্ষে কখনো কোনো সুসংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না; রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যে ধ্রুপদী সংগ্রাম বহু শতাব্দী ধরে ইয়োরোপকে আলোড়িত করেছিল, এটা যেন তার সর্বাধিক

নিকটবর্তী রূপ। ভারতবর্ষে আমরা দেখি সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জনের সংগ্রাম ব্রাহ্মণ ও রাজন্যের মধ্যে।

বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে বহুবিধ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। অথর্ববেদ বিষয়ক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, একটি বিশেষ সময় পরিধিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সার্বভৌম রাজ্যের উত্থান হচ্ছিল–এটা প্রকৃতপক্ষে সেই যুগেরই বৈশিষ্ট্য যার সূচনায়। ঋগ্বেদের প্রথম ন'টি মণ্ডল সংকলিত এবং উপসংহারে উপনিষদগুলি রচিত হয়েছিল। সার্বভৌম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠনগুলি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উত্থিত হয়ে সংলগ্ন রাজ্যসমূহ অধিকার করে নিচ্ছিল। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ের বিশিষ্ট লক্ষণরূপে সার্বভৌম রাজ্যসমূহের উত্থান অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সুচিত হয়েছে; সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এসব রাজ্যই ক্রমে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক চিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছিল।

যদিও খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে লোহার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিল, তবু খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম (মতান্তরে সপ্তম) শতাব্দীর অন্তভাগের পূর্বে সম্ভবত লাঙলে লোহার ব্যবহার হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যখন সে-ধরনের প্রয়োগ শুরু হ'ল, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মানুষের সাহায্যে ও স্বল্পতর প্রচেষ্টায় অনেক বেশি জমি চাষ করা সম্ভব হয়ে উঠল। আবার, জমি যদি সমগ্র কৌমের পরিবর্তে একক পরিবারগুলির স্বত্বাধীন হয়, কেবল তখনই এই অবস্থা লাভজনক হতে পারে, কারণ, তখন ন্যূনতম চাহিদা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় উৎপাদনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কৌম গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদিত বস্তু সমানভাবে বন্টন করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তিলাভের পরে অর্থাৎ ব্যক্তি বা পরিবারের এককভাবে বাণিজ্য-প্রচেষ্টার সম্ভাবনায়। বস্তুত প্রকৃত লোহার লাঙল প্রবর্তনের প্রভাব সত্যই সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বর্ধিত করা ছাড়াও অনেক প্রতিক্রিয়া-পরম্পরার জন্ম

দিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে দেশের সাংস্কৃতিক চিত্রকে আমূল পরিবর্তিত করে দিয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-কৌশল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন আরও লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠল। বিম্বিসারের সময় থেকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫২০) মগধ ক্রমশ রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজ্যসীমা বিস্তার করতে শুরু করেছিল, ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০-এর মধ্যে অঙ্গ, বিদেহ, কাশী ও কৌশল মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে সম্পূর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকা অর্থাৎ আধুনিক উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গ নন্দ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

কৌম জীবন ভেঙে যাওয়ার পরেই এধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, কেননা তখন কৌম বা গোত্রের পরিবর্তে পরিবার-ভিত্তিক ভূমির সত্বাধিকার দেখা দিয়েছিল। পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাণিজ্যপথের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে; অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বিশেষভাবে তাম্রা ও লোহার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই সেদিকে জনসাধারণের বসতি বিস্তার করার প্রেরণা এসেছিল। পথিমধ্যে গভীর অরণ্যকে অগ্নিদগ্ধ করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহার অঞ্চলের বিস্তৃত ভূমিকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত করে তোলা হয়েছিল। লোহার লাঙল ব্যবহারের ফলে উদ্বৃত্তি খাদ্য দ্বারা সেইসব অনুৎপাদক নগর ও তাদের দুর্গসমূহের জন্য আহার সংস্থান করা সম্ভব হল, যেগুলি দ্রুত বর্ধমান সার্বভৌম রাজ্যসমূহের কেন্দ্র। সেসব স্থানে বণিকরা বাস করত যাদের বহুদূর অবধি ভ্রমমাণ বাণিজ্য শকট ক্ষত্রিয়দের দ্বারা রক্ষিত হত। রাজারা এধরনের বণিকদের আশ্রয় দিয়ে ও মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করে লাভবান হতেন। কারুশিল্পীদের বিভিন্ন সঙ্ঘের কথা আমরা শুনি; প্রতিটি শিল্পের একজন 'জেট্ঠক' বা নেতা

থাকতেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের তখন নতুনভাবে প্রসার হচ্ছিল। এই যুগেই শেষ-পর্বের উপনিষদগুলি রচিত হয়েছিল।

ব্যাপক বাণিজ্যের পক্ষে বিনিময়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেহেতু খুব একটা সহায়ক ছিল না, তাই ধীরে ধীরে মুদ্রাব প্রবর্তন হ'ল। বিভিন্ন ধাতুর খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে ধাতুশিল্প যখন সুসংবদ্ধ রূপে নিল, সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে বাণিজ্যিক ও রাজকীয় মুদ্রার প্রচলন শুরু হ'ল। বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থা সমৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্তি উৎপাদন মুষ্টিমেয় লোকের লাভের পথ প্রশস্ত করল; শ্রেষ্ঠী এবং সার্থবাহদের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা গেল। বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি যখন সমুন্নত হয়, তা শুধু সম্পদের উৎসই হয় না, ভাবাদর্শ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃত শক্তি হয়ে উঠে। তাই, তৎকালীন বণিকশ্রেণী যেহেতু প্রচলিত যজ্ঞধর্মের পরিবর্তে উদীয়মান নব্য ধর্মীয় ও দার্শনিক মতগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং বিভিন্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাই সমসাময়িক সমাজের উপসংগঠনে এর প্রবল প্রভাব দেখা গেল।

সমাজের কৌম-চরিত্র ভেঙে পড়ার পরে মগধের উত্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্ক সূচনার সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। নব্যচিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতাদের অধিকাংশ যে মগধ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। কৌম-অন্তর্বর্তী পুরাতন সামাজিক সম্পর্কগুলি শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছিল বলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির স্বার্থে সেগুলি চুর্ণ করতে হ'ল। প্রাথমিকভাবে মগধে খ্রিস্টপূর্ব ৫২০ থেকে ৩৬০ অব্দের মধ্যে সমাজ-সংস্থায় নতুন বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত হয়েছিল।

বর্ণভেদ তখনো পর্যন্ত কতটা শিথিল ও সঞ্চরণশীল থাকায় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে লব্ধ অর্থ তিনটি উচ্চতর বর্ণের যে কোনো একটির হাতে সঞ্চিত হতে পারত। পূর্ণবিকশিত মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি অবশ্য আরো পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিল : মুদ্রার পরিবর্তে তখনো ছণ্ডির প্রচলন ছিল। কিন্তু তাতেও উদ্বৃত্তি উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায়, যার সঙ্গে শোষণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য; কারণ, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় উদ্যমী ব্যক্তি বাণিজ্য করত এবং ধনাঢ্য হয়ে উঠে তারা দরিদ্রদের বাণিজ্য ও উৎপাদন উভয় কর্মেই নিযুক্ত করত। লোভ হয়ে উঠল প্রধান মানসিক বৃত্তি; ফলে কৌম অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ার পরে সম্পদের অসম বন্টন বিপুল জনতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সূচনা করল। এই ভাগ্যহীন শোষিত জনতার মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্যবাদ ও হতাশা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল; জীবনে শেষ পর্যন্ত কোথাও ন্যায়বিচার নেই বলেই তাদের কাছে প্রতিভাত হ'ল; অস্পষ্টভাবে জনসাধারণের মধ্যে এই উপলব্ধির সূচনা হ'ল যে, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির লোভ সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠছে। মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রাথমিক স্তরের উন্মেষ হয়েছিল এই পর্বে।

এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের পুনরাবৃত্ত ধ্রুবপদগুলির অন্যতম হ'ল 'নির্লোেভ শ্রোত্রিয়' কিংবা ঈশোপনিষদের প্রারম্ভে রয়েছে ধনলিপ্সার প্রতি নিষেধবাণী; তেমনি প্রজাপতি অলৌকিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে মানুষকে দানশীল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। শূদ্রেরা এই পর্যায়ে নিতান্ত ভরণপোষণের বিনিময়ে যথাসাধ্য শ্রমশক্তির জোগান দিয়েছে; ফলে মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারী ধনী ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত সম্পদ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেল। উৎপাদন যখন এমন স্তরে উপনীত হ'ল যে তা অনুৎপাদক নগরগুলির ভরণপোষণ করতে পারে এবং অন্তর্দেশীয় ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী জোগান দিতে পারে, তখনই

জনসাধারণের বিপুল অংশের পক্ষে জীবন এই প্রথম অনিবার্য অমঙ্গলেব প্রতিমূর্তি হয়ে উঠল, যার থেকেই পলায়ন-ই কাম্য বলে মনে হল।

কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ও বিপুলভাবে কৃষিব্যবসায়ের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারবাহী পশু নুতন গুরুত্ব লাভ করল; ফলে, ক্রমবর্ধমান যজ্ঞগুলিতে তাদের অনিয়ন্ত্রিত হত্যা এই পর্যায়ে অযৌক্তিক অপচয়রূপে প্রতিভাত হ'ল। বিপুল কৃষিব্যবসায়ের প্রমাণ বৌদ্ধ জাতকে পাওয়া যায়– জাতকের সমাজ মোটামুটিভাবে উপনিষদের সমসাময়িক। জাতকের কাহিনীতে (৩ : ২৯৩; ৪ : ২৭৬) আমরা ৮,০০০ একর ব্যাপ্ত কৃষিখামারের কথা শুনি, যাতে ৫০০টি লাঙল ব্যবহৃত হত। সুত্রনিপাতে (১ : ৪) বলা হয়েছে যে, এই জমি সাধারণত ব্রাহ্মণদের অধিকারে ছিল। জরথুস্ত্র যে ধর্মীয় আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, তাও এই বিপুল কৃষিখামারের সহগামী; অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পশুর অর্থহীন অপচয় পরোক্ষভাবে বন্ধ করার তাগিদ থেকে ঐ আন্দোলনের সূত্রপাত। সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পিছনেও উৎপাদনব্যবস্থায় অপচয় রোধ করার জন্য তৎকালীন সমাজের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে সমস্ত ধরনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উত্থানের মধ্যে তৎকালীন অনুষ্ঠানসর্বস্ব সমাজে বিপুল আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিদারুণ দারিদ্র্যের সহাবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে। যজ্ঞধর্ম যদিও তখনো পর্যন্ত অবশ্য পালনীয়রূপে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, সেসময়ে আজীবিক, বৌদ্ধ ও জৈন" মর্মর মতো প্রতিবাদী ধর্মমতগুলি যজ্ঞের অপ্রয়োজনীয়তা ও নৈতিকভাবে অহিংসার একান্ত আবশ্যকতা প্রচার করেছিল। লক্ষণীয় যে, উপনিষদ পর্যায়ের ব্রাহ্মণ্যধর্মও যজ্ঞকে 'অদৃঢ় তরণী' ব'লে বর্ণনা করেছে (মুণ্ডক ১ : ২ : ৭)।

জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ ব্যয়বহুল যজ্ঞের কেবল নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপেই বিদ্যমান ছিল, কেননা যজ্ঞ মূলত রাজাদের এবং নব্য ধনিক সম্প্রদায় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পৃষ্ঠপোষকতার অনুষ্ঠিত হত। পুরোহিত সম্প্রদায় ও তাদের সহকারীরা জনসাধারণের সংখ্যালঘু অংশ মাত্র ছিলেন; কেবল তারাই যজ্ঞ থেকে লাভবান হতেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ফলদানে যজ্ঞগুলির বারংবার ব্যর্থতাও নিশ্চিতভাবে তাদের উপযোগিতা সম্পর্কে কতকটা সংশয়ের জন্ম দিচ্ছিল। তবে যজ্ঞ পার্থিব জীবনে সমৃদ্ধি এবং পরলোকে পার্থিব আনন্দের নিরবিচ্ছিন্ন অনুব্যাপ্তির আশ্বাস দিত। কিন্তু এই পর্যায়ে জীবন যেহেতু মুখ্যত দুঃখময় ও অবাঞ্ছনীয় বলে প্রতিভাত হচ্ছিল এবং ইহলোকের যজ্ঞাদি ফলপ্রসূ কর্ম পরলোকে শুধুমাত্র পুনর্জন্মেরই হেতু, তাই এই পুনরাবৃত্ত অমঙ্গল থেকে আত্যন্তিক মুক্তি পুনর্জন্মের শৃঙ্খল-মোচনই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ এক্ষেত্রে যজ্ঞ সামান্য মাত্রায়ও সহায়ক হতে পারত না। ভারতীয় জীবনে এই যে আঁধির প্রকাশ ঘটেছিল, বস্তুত তা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশে ব্যাপ্ত ছিল। কেননা গ্রিস, ইরান, চীন ও মিশর, মেসোপোটামিয়ায় প্রায় এই সময়ে অনুরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিক অস্থিরতা ও বহু দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে চীনে লাওৎসে এবং ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে কনফুসিয়াস আর গ্রিসে হেরাক্লিটাস, এ্যানাক্সাগোরাস, এম্পিডোক্লিস ও জেনোফানেস-এর জন্ম হয়েছিল। অধিকাংশ গবেষকদের মতে জরথুস্ত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। ভারতবর্ষে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইহুদীদের তোরাহ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে সংকলিত হয়েছিল; বিদেশী প্রভাব পারস্য থেকে ভারতে এসে পৌঁছেছিল, দারিয়ুস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে সিন্ধু জয় করেছিলেন। গ্রিস, চীন ও মিশর বাণিজ্যসূত্রে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। উপনিষদ যুগের শেষ পর্বে, বিশেষত আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের ফলশ্রুতি হিসাবে, গ্রিসের সঙ্গে

ভারতবর্ষের চিন্তা ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে বিনিময় শুরু হয়। পূরণ কশ্যপ, অজিত কেশকম্বল, কুকুন্দ কাত্যায়ন, নিগ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র, মস্করী গোশাল, রুদ্র রামপুত্র, সঞ্চয় বৈরাটিপুত্র প্রভৃতি নাম তৎকালীন ভারতবর্ষে বহুব্যাপ্ত আধ্যাত্মিক আলোড়নের ইঙ্গিত বহন করে, এদের মধ্যে বৈরাটিপুত্র সঞ্জয় ও মস্করী গোশাল ছিলেন বুদ্ধদেবের সমকালীন। নানাভাবে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ব'লে নতুন চিন্তাধারা ও জীবনের মূল্যবোধগুলির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নূতন প্রবণতার সূত্রপাত হল। এ-সমস্ত প্রতিবাদী ধারার বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ হ'ল যজ্ঞের চূড়ান্ত মূল্যের ও তাৎপর্যের প্রত্যাখ্যান; জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তিমূলে নিহিত রয়েছে চিরাগত ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যানের মনোভাব। একটি নতুন প্রতীকী ও নিগূঢ় রহস্যমূলক বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করে তা শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

এই নতুন আধ্যাত্মিক প্রবণতার উদ্ভূত হওয়ার পিছনে অন্যতম সহায়ক উপাদান ছিল প্রাগার্য বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংঘাত ও চূড়ান্ত সংশ্লেষণ। আর্যরা যখন প্রথম এসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেছিল, সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা দাস বা শূদ্ররূপে অধিকৃত হয় নি–তারা সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পলায়ন করেছিল। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্বের সূচনায় অধিকতর ভূমির প্রয়োজনে এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বহুধাতুসমৃদ্ধ জমিতে প্রবেশাধিকার লাভের তাগিদে অরণ্য অঞ্চল অগ্নিদগ্ধ করার নূতন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হল। শতপথ ব্রাহ্মণের বিদেঘ মাধবের কাহিনীতে এবং মহাভারতের খাণ্ডব দহনের উপাখ্যানে আমরা তার প্রমাণ পাই। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ গবেষকদের অভিমত এই যে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং বৈদিক জনসাধারণের পূর্বমুখী সম্প্রসারণের সময়ে অর্থাৎ খুব প্রাচীন কালপর্যায়ে মহাভারত রচনার শুরু এবং খাণ্ডব

উপাখ্যানও মূলত ঐতিহাসিক। পরবর্তী কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যুগে ধাতু ও ধাতুশিল্পীরা ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মহাভারতের খাণ্ডব-উপাখ্যানে প্রদর্শিত হয়েছে যে, ধাতু গলানোয় বিশেষজ্ঞ ও নির্মাণবিদ্যায় দক্ষ অসুরবংশীয় স্থপতি ময়কে অন্বেষণ করার জন্য অরণ্যদহন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে কৌম সমাজের চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটেছিল উপনিষদের যুগে। পিতৃ-উপাসনার ঐন্দ্রজালিক বন্ধন ভেঙে যাওয়ার মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। নূতন বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির জন্য এমন গতিশীল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল, যারা পারিবারিক ও স্থানগত বন্ধনে আবদ্ধ নয়; আর, এইজন্য কৌম জীবনের রক্তসম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাচীন ধরনের সামাজিক বন্ধন ভেঙে মিশ্র-জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত অধিকতর স্বাধীন প্রশাসনিক সংগঠন প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। পিতৃ-উপাসনা ছিল সম্পূর্ণত কৌম জীবনের বৈশিষ্ট্য; অন্যদিকে উপনিষদে এমন সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে যেখানে জনসাধারণ কৌম-গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল।

আর্যরা বিভিন্ন ধাতুর খনিতে সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের দিকে এগোলেন, সম্ভবত পথিমধ্যে গঙ্গা-যমুনা বিধৌত দোয়াব ও ধাতুসমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীরা আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, এবং শান্তিপূর্ণভাবে আর্যধারায় মিশে গিয়েছিল অথবা সেসব অঞ্চল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আর্যদের যাত্রাপথের উভয়দিকে এবং বিশেষভাবে বিন্ধ্য অঞ্চলে ও আর্যায়ত্ত মধ্যদেশ অঞ্চলের সীমান্তবর্তী অরণ্যভূমিতে প্রাগার্যরা বসবাস করত। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক মিশ্রণ, কৌম সমাজের ক্ষয়, উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন, ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারণ, মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন, ধাতুর ব্যবহার, বর্ষগণনাপঞ্জী ও

লেখনপদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে সম্মিলন ও একীভবনের সূত্রপাত হয়েছিল—তার অনিবার্য প্রভাবে যজ্ঞধর্মের প্রাচীন রূপটি অপ্রচলিত হয়ে গেল, অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনের অনুবর্তী আর রইল না।

যখন যজ্ঞগুলি এত অসংখ্য, দীর্ঘায়িত, জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠল যে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারত, তখন প্রতিবাদী মনোভাব ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল; জনসাধারণ যজ্ঞের যৌক্তিকতা ও ঈপ্সিত ফলদানে ব্যর্থতা দেখে সেগুলির প্রতিশ্রুত শক্তি সম্পর্কে সংশয় পোষণ করতে লাগল। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক ও প্রতীকী ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের পুনর্বিশ্লেষণ প্রকৃতপক্ষে দ্রুত ক্ষীয়মান ধর্মীয় বিশ্বাসের পুনরুদ্ধার করার শেষ মরিয়া প্রচেষ্টাকেই অভিব্যক্ত করছে। কিন্তু তখন ভিন্ন ধরনের ভাবাদর্শ উদ্ভূত হয়ে প্রচলিত চিন্তাধারাকে যে প্রত্যাহ্বান জানালো, যজ্ঞধর্ম যথাযথভাবে তার প্রত্যুত্তর দিতে অসমর্থ হ'ল; যেমন যজ্ঞের সাহায্যে কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন। অবশ্য জন্মান্তরবাদ দুরূহতম সমস্যা সৃষ্টি করেছিল কারণ, পুনর্জন্ম অবিমিশ্র অমঙ্গল বলেই বিবেচিত হত এবং তাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে উঠল পুনর্জন্ম-পরম্পরার সমাপ্তি ঘটানো। কিন্তু কোনও যজ্ঞে এই আশ্বাস পাওয়া যায় নি।

ফলে, এই নুতন সমস্যা সমাধানের আশায় জনসাধারণ স্বভাবতই ভিন্নপথগামী হতে বাধ্য হ'ল। আর্যবৃত্তের বহির্ভূত জনসাধারণের মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কয়েকটি সম্ভাব্য বিকল্প পাওয়া গেল। এমনকি বহুপূর্বে ঋগ্বেদের যুগেও আমরা

ব্রাত্যদের উল্লেখ পেয়েছি, যাদের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাস পরস্পর-ভিন্ন হলেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে তাদের সমধর্মিতা ছিল : বৈদিক যজ্ঞ-ধর্মের প্রত্যাখ্যান ও বিকল্প মূল্যবোধ গ্রহণ। এসব জনগোষ্ঠীর বিচিত্র ভাবাদর্শের মধ্যে যে নতুন

জীবনদর্শনের সম্ভাবনা ছিল, উপনিষদ যুগের শেষ পর্যায়ের পূর্বে তার প্রতি মানুষেবা দৃষ্টি বিশেষ পড়েনি, অথচ এসব পরস্পর-ভিন্ন পরিব্রাজক তপস্বীগোষ্ঠীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার ঐতিহ্য বৈদিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। এদের মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়,–আদিম জনগোষ্ঠী, যারা আর্য আক্রমণের ফলে উদ্বাস্তু হয়েছিল এবং যারা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার গভীর বহির্ভূত ছিল। এদের মধ্যে উত্তর ও মধ্য অঞ্চল এবং অঙ্গ ও মগধের মতো পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা ব্রাত্য নামে পরিচিত ছিল। মূলত, এরা ছিল কৃষিজীবী ও পশুপালক জনগোষ্ঠী; তবে এদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক ধাতুশিল্প, কারুশিল্প ও বাণিজ্য নিরত ছিল। বৌদ্ধ বিবরণগুলিতে এরা সমৃদ্ধিশালী গোষ্ঠীরূপে চিত্রিত হয়েছে। সম্ভবত, ব্রাত্যস্টোম ছিল এমন একটি অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে এরা আর্যসমাজে প্রবিষ্ট হতে পারত, কেননা সমৃদ্ধিশালী গোষ্ঠীর আত্মীকরণ আর্যদের পক্ষে সুবিধাজনক ও আকর্ষণীয় ছিল। অন্যদিকে এরাও যেসব উদীয়মান রাজ্যে বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা আছে, এমন সব রাজ্যে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মীভূত হওয়ার প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ বোধ করেছিল– যেহেতু তাদের খনিজ দ্রব্য, কৃষিজাত উদ্বৃত্তি ও শিল্পজাত পণ্যগুলিকে লাভজনকভাবে হস্তান্তরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়, একটি গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন সন্ন্যাসী, যোগী, মুনি ও বৈখানসদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যাঁরা নৈতিক জীবন যাপন করতেন এবং বিবিধ প্রকারের সাধন-পদ্ধতি ও সাধনার জন্য কৃচ্ছ্র-প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেন। রক্ষণশীল বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নানারূপেই অভিব্যক্ত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই অরণ্যে বাস করতেন এবং সেই সূত্রে যজ্ঞধর্ম সম্পর্কে বিতৃষ্ণ আর্য জিজ্ঞাসুদের সঙ্গেও এদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এধরনের তাপস-গোষ্ঠীর প্রাথমিক উল্লেখ ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকে পাওয়া গেছে।

মানসিক আরাধনার যে পদ্ধতি মূলত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বৃত্ত-বহির্ভূত ছিল, উপনিষদের যুগে ক্রমশ তা আর্যদের ধর্মীয় ভাবনায় অনুপ্রবিষ্ট হ'ল।

তৃতীয়ত, ভ্রমমান দার্শনিকদের কিছু কিছু গোষ্ঠী গ্রিস দেশের 'সোফিস্ট'দের মতো ইতস্তত বিচরণ করতেন, কখনো একাকী কখনো বা শিষ্যবর্গকে নিয়ে এরা চলতেন। এদের প্রত্যেকেই নীতিশাস্ত্র, ধর্ম বা অধ্যাত্মবিদ্যা, কর্মবাদ, পুনর্জন্মবাদ, প্রেততত্ত্ব ও মুক্তি সম্পর্কে কোনো না কোনো নতুন মতবাদ প্রচার করতেন। এ সমস্ত গোষ্ঠী প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিলেন প্রতিবাদী, কারণ এদের কেউই যজ্ঞধর্ম অনুসরণ করতেন না। এরা একত্রে ব্রাহ্মাণ্য-ধর্মের প্রাসঙ্গিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যাহ্বান জানাতে সফল হয়েছিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারটি ছিল গৌণ ও সমাজব্যবস্থাপকদের অগোচর ঘটনা, কেউ পূর্বনির্দিষ্ট সূত্র ধরে এটি ঘটায়নি।

এই নতুন সমস্যার বাতাবরণে তৎকালীন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা বিভিন্নভাবে প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু, তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি গোষ্ঠী সাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রথমত, জৈনধর্ম; কয়েক শতাব্দী ধরে মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল এটি সীমাবদ্ধ ছিল। জৈনদের অধ্যাত্মবাদী চিন্তার সঙ্গে বৌদ্ধ ভাবনার কতকদূর পর্যন্ত সাদৃশ্য ছিল; তবে শেষোক্তের তুলনায় ভারতবর্ষে তারা যে দীর্ঘতর জীবন পেয়েছিল, তার কারণ সাধারণ মঠ-বহির্ভূত ভক্তদের পক্ষে জৈনধর্ম একটি ব্যাপক আচরণবিধি নির্মাণ করতে পেরেছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাস-জীবনের উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছিল। স্পষ্টত গণধর্মান্তরের ফলে জৈনদের মতবাদ আরো ব্যাপক ও কতকটা সারগ্রাহী হ'ল, সাধারণ গৃহী ভক্তদের জন্য এখানে যথার্থ স্থান নির্দেশিত হ'ল। একই যুক্তি দিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দীর্ঘ জীবন লাভ ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমে ভিন্নমতাবলম্বী ও প্রতিবাদী তপস্বী গোষ্ঠীদের ঐকামীভূত করার বিচক্ষণতা দেখিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম

‘আপিন প্রভাবের পরিধি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সঙ্গে যে-গৃহস্থরা জনসাধারণের বিপুল অংশ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের শক্তির মূল স্তম্ভরূপে পরিগণিত হয়েছিল, তাদের জন্যও সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সামাজিক বিন্যাস পাওয়া গেলো।

দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করলেও কয়েক শতাব্দী পরে উপমহাদেশ থেকে প্রকৃতপক্ষে বিদায় নিয়েছিল। তৃতীয় ধারা অর্থাৎ উপনিষদীয় বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সমকালীন আধ্যাত্মিক প্রয়োজননির্বাহের উপযোগী করে তোলে এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মৌল উপাদানগুলিকে নিজ মতবাদের মধ্যে ক্রমশ আত্মসাৎ করে নিয়ে নতুন আধ্যাত্মিক আলোড়নকে সবচেয়ে সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই ধারা নিজের অবস্থানকে গ্রহণযোগ্য করতে পেরেছিল; এজন্য বহু দীর্ঘ ও জটিল যজ্ঞে গোসম্পদের অপ্রয়োজনীয় অপচয় সম্পর্কে জনসাধারণকে নিরুৎসাহ করার সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তিলাভের উচ্চতর লক্ষ্যের প্রতিও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। এই মুক্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভের দ্বারাই সম্ভব–এই মত ধীরে-ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। অবশ্য, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপনিষদে অভিব্যক্ত আধ্যাত্মিক পরিশীলনের প্রবণতায় কোনভাবে বিপুল জনসাধারণের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় নি, তারা সম্ভবত তখনো পর্যন্ত একাগ্রভাবেই প্রাচীনতর বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ যজ্ঞধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করত। এর অন্যতম কারণ হল, একমাত্র এধরনের ধর্মে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের যৌক্তিকতা সিদ্ধ হ’ত; এই বিশ্বাস ব্রাহ্মণ্য-চিন্তার একটি আবশ্যিক উপাদান। এই ঐন্দ্রজালিক শক্তি অর্থাৎ প্রাচীনতর ‘ব্রহ্ম’ (অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিযুক্ত বচন) এর প্রতি প্রশ্নসংকুল প্রত্যাহ্বান উত্থাপিত হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কযুক্ত সমস্ত কিছুই নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হল। ইন্দ্রজাল যেহেতু যজ্ঞানুষ্ঠানের মৌল ভিত্তি তাই পুরোহিত

শ্রেণীর নিকট তা অপরিহার্য; ফলে, তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার প্রতি ন্যূনতম প্রশ্নের আশঙ্কাও সহ্য করা হয় নি। সুতরাং বিদ্বৎসমাজের মধ্যে নতুন অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যের রচনা ও প্রচারের দিনগুলিতেও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রাগ্বৈদিক স্থানীয় উপাসনা-পদ্ধতি জনসাধারণের ধর্মীরূপে প্রচলিত ছিল। কারণ, অন্তত আরো কয়েকটি শতাব্দী ধরে তা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল; বিশেষত যে-জনসাধারণ ধর্মের নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশ্বাস পেতে চায় তাদের জন্য এই স্থিতাবস্থা কার্যকরী হয়েছিল।

এই পরিস্থিতি একদিকে স্পষ্টত জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশকে তুষ্ট করেছিল, অন্যদিকে অগ্রগামী চিন্তাবিদরা এই প্রশ্নের দ্বারা তাড়িত হচ্ছিলেন : কোথায় এবং কিভাবে মুক্তিপ্রদ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর। আর, ঠিক এখানেই ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী আচার্য ও তপস্বীরা সমাধানের একটি পথ দেখালেন। যেহেতু তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অরণ্যবাসী, তাই শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে গমন ও বসবাস আবশ্যিক বলে বিবেচিত হল; অথচ ব্রাহ্মণ্যজীবনের শৃঙ্খলাবোধ অনুযায়ী বেদাধ্যয়নের পরে তরুণ যুবকের পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রত্যাবর্তনই ছিল বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে, এই যুগের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণযুক্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলনে নতুন আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে অরণ্যে দীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান ছিল আবশ্যিক। সুতরাং ব্রাহ্মাণ্য ধর্ম পারস্পরিক বোঝাপড়ায় মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হল : পঞ্চাশ বছর বয়সের পর বেদাধ্যয়নে ব্রহ্মাষণ, বহু যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবষণ শোধ করে, নিজ পরিবার গঠনের দ্বারা পিতৃঋণ এবং অতিথিসেবা ও অন্যান্য প্রাণীদের জন্যে অন্নদানে প্রাণিমাত্রেয় ঋণ পরিশোধ করার পরেই শুধু অরণ্যে গমন করে বনবাসী জীবনযাপনের অনুমতি পাওয়া গেল। অরণ্যে ন্যূনতম যজ্ঞের আয়োজনই ছিল যথেষ্ট। একে বলা হল বানপ্রস্থ।

কিন্তু ভ্রমমাণ দার্শনিক শিক্ষকরা বহু জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারী ছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে তারা দীর্ঘকাল অবস্থানও করতেন না। ফলে, আরো আপোষের ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে হ'ল—তখন জীবনের শেষ পর্যায়টি একাকী ভ্রমমাণ অবস্থায় অতিবাহিত করার নিয়ম নির্দেশিত হল। তপস্যা ও সন্ন্যাস-জীবনকে বিশেষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানে সমুন্নীত করার ফলে চতুর্থ আশ্রম ব্যতি বা "সন্ন্যাস' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। যতিদের জীবনযাপন যজ্ঞকেন্দ্রিক বৈদিক সমাজের একটি সম্ভাব্য বিকল্পরূপে ঋগ্বেদের সময় থেকেই বর্তমান ছিল—উপনিষদের যুগে রক্ষণশীল বৈদিক সংস্কৃতি তাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল।

সুসংগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অভাবে আশ্রম'-এর ভাবাদর্শ বহুলপ্রচলিত হয়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন করে নেয়; চার বা পাঁচ শাল তাব্দী ধরে ব্রহ্মচারী, গৃহী ও বানপ্রহী—এই তিনটি স্তর সামাজিক অনুমোদন পেয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব শেষ দুটি শতাব্দীতে সন্ন্যাসী বা যতির বগীকরণ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিলাভ করে।

ক্ষত্রিয়গণ যে এই যুগের নব্যচিন্তাধারার বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন-ত বিস্ময়কর নয়। সমাজের যে অংশ যজ্ঞের উপযোগিতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম মোহমুক্ত হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবে তারা হ'ল ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায় অর্থাৎ রাজন্য, কেননা এরাই ক্রমবর্ধমান বহুব্যয়যুক্ত জটিল ও দীর্ঘায়িত যজ্ঞানুষ্ঠানের আর্থিক দায় বহন করতেন। যোদ্ধা হিসাবে একমাত্র তীরাই অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হতেন বলে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন ও প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ খুব স্বাভাবিক।

কর্মবাদ ও দেহান্তর-গ্রহণের নবোদ্ভূত তত্ত্ব পুরাতন বা নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায়নি, এধরনের গ্রস্থিল সমস্যা সমাজের অন্য বর্গের তুলনায়

ক্ষত্রিয় শ্রেণীকেই অধিক বিড়ম্বিত করত। ইতোপূর্বে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অবদমিত দ্বন্দ্বের আভাস লক্ষ্য করেছি; দুই শ্রেণীর মধ্যে আর্থনীতিক স্বার্থজনিত সংঘাতও ছিল। পরগাছার মতো পুরোহিত সম্প্রদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্ধন, ব্যাপ্তি ও নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে প্রবলভাবে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে আর্থিক দায়িত্বের বিপুল বোঝা ও যজ্ঞের অনিশ্চিত ফল এবং নব্যচিন্তাধারাপ্রসূত প্রত্যাহ্বানের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দানে সমগ্র যজ্ঞতত্ত্বের ব্যর্থতা পৃষ্ঠপোষক ক্ষত্রিয় প্রস্তুত হল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, এক অর্থে কর্মবাদ যজানুষ্ঠান-ব্যবস্থাপক পুবোহিতদের শ্রেণীঃস্বার্থের পরিপহী ছিল, কারণ তা যজ্ঞবহির্ভূত জ্ঞানলব্ধ পুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছে।

নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত জীবনও স্বর্গলাভে সমর্থ–এই মতবাদ সমাজের অন্যজ্ঞ পরায়ণ অংশের পক্ষে যথোপযুক্ত হলেও তা যাজক-শ্রেণীর মৌল অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছিল। তাই, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ–এই উভয়বিধ গ্রন্থ বারেবারে দুটি বর্ণের পারস্পরিক নির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।– তৎকালীন সমাজে যার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, অথচ প্রচলিত ধর্মচর্য ও উপাসনাপদ্ধতি যার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। ব্রাহ্মণদের স্বার্থ বিঘ্নিত করার অপরাধে ক্ষত্রিয়দের ধবংস সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন সতকীকরণের মধ্যে আমরা আরো একটি প্রমাণ পাই যে, এধরনের ঘটনা তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মাণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেউ যে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ছিল না এবং জীবন ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল– উপনিষদের বিবরণ থেকে এই তথ্য যেমন স্পষ্ট, তেমনি আমরা বুঝতে প্লারি যে, উভয়বর্ণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতজনিত স্নায়বিক উদ্বেগ নিরসন করার পথ অন্বেষণ করারও প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনের আত্যন্তিক তাড়নায়

এ ধরনের বিশিষ্ট সমন্বয়ের ভিত্তিতে সমাধান আবিষ্কৃত হল, আশ্রমধর্মের প্রবর্তন তারই একটি উপায়।

ত্রিবিধ প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান, পশু, সোম ও ইষ্টির মধ্যে প্রথম দুটিতে পশুবলি প্রয়োজন। সমৃদ্ধির দিক দিয়ে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী নগররাষ্ট্রগুলির উত্থান এবং ততদিনে সামাজিক সম্মানের প্রতীকে পরিণত আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে গোধনের প্রবল অপচয় হচ্ছিল। সেসময় লোহার লাঙ্গলের সঙ্গে ভারবাহী পশু কৃষিকার্যের অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছিল বলে এই অপচয়ে বৈশ্য সম্প্রদায় বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। শুধু তাই নয়, বাণিজ্যমার্গে যাতায়াতকারী শকটগুলির জন্যও এসব পশু প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং অতিপাল্লবিত জটিল যজ্ঞাগুলি বৈশ্য সম্প্রদায়ের স্বার্থকে কঠোরভাবে আঘাত করেছিল। তাই যজ্ঞবিরোধী বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম যে বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুদৃঢ় ভিত্তি ও আশ্রয় পেয়েছিল, তা মোটেই আকস্মিক নয়, কারণ এই যুগেই সমাজে বৈশ্যদের সমুত্থান সূচিত হয়েছিল।

উপনিষদে ক্ষত্রিয়শ্রেণী যদিও প্রধান সামাজিক বর্ণরূপে চিত্রিত হয়েছে, তব এই যুগেই বাণিজ্যরত বৈশ্যশ্রেণী, প্রকৃতপক্ষে সমাজে তাদের অবস্থানকে মর্যাদাযুক্ত করে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে সীমা-বহির্ভূত দেশগুলির সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল এবং ব্যবসায়ীরা ক্রমশ অধিক সমৃদ্ধিশালী ও সমাজের অন্য বর্গের উপর কম নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। তাই উপনিষদের যুগ শুরু হয়েছিল শক্তিশালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের পরস্পর-নির্ভরতা দিয়ে; ক্রমশ চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের ভার ক্ষত্রিয়বর্গের উপর বিন্যস্ত হল। এই যুগের শেষ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাধান্য যদিও তখনো পর্যন্ত মূলত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদেরই ছিল, তবু বৈশ্যশ্রেণীও নব্য চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন,—এবং এদেরই হাতে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি থেকে লব্ধ সম্পদ

কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। এরা ক্রমশ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। স্থিতিশীল যজ্ঞীয় ধর্মচর্যার যেহেতু আর্থনীতিক দিক থেকে বহুমূল্য গোধন ও সম্পদের অপচয় ঘটে, তাই তার পরিবর্তে ব্যয়ভারহীন ও নীতিনিষ্ঠ মুক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই ক্রমে জনসাধারণের কাম্য হয়ে উঠল।

অন্যদিকে বর্ণভেদপ্রথা দ্রুত শিলীভূত ও বর্ণগত সঞ্চরণশীলতা নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে শূদ্রশ্রেণী সমাজে নিজেদের অধিকারের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল। এই অধিকারগুলি সমাজের সুদিনেও তাদেব পক্ষে নিরতিশয় স্বল্প ছিল, কিন্তু এই যুগে তা আরো কমে গেল। তিনটি উচ্চতর বর্ণের প্রতি শূদ্রদের অধিকতর সেবাপরায়ণতা যে সমাজেব অধিকর্তাদের পক্ষে বেশি কাম্য হয়ে উঠেছে, তা সেসময়ে রচিত প্রাচীনতর ধর্মসূত্রগুলির সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট। শূদ্ররা যেহেতু সমাজের বিপুল অংশ, বর্ণনির্ভর সামাজিক অধিকার ও অনমনীয় বর্ণভেদপ্রথার উ*া বা প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞধর্ম সম্পর্কে তাদের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বেড়েই গেল, কেননা বর্ণগত বিদ্বেষের ফলে তাদের সামাজিক অবস্থান প্রায় অমানবিক স্তরে নেমে গিয়েছিল। এই স্তরে বর্ণ এবং বর্ণগত অবস্থান, বর্ণগত মর্যাদাকে অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদের বিশেষভাবে প্রতিফলিত করেছে। বৈশ্যদের শ্রেণী-স্বার্থ যদিও অনেকাংশে বণিক ও কারুশিল্পীদের সঙ্ঘ দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল, তবুও শূদ্রদের অবস্থান ছিল নিতান্ত হেয়, যেহেতু তারা সম্পূর্ণত প্রভুদের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং এটা একটুও বিস্ময়ের নয় যে বৈশ্যরা নূতন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী ধর্মপ্রচারকদের চতুস্পার্শ্বে ধীরে ধীরে সমবেত হয়ে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও অন্যান্য তপস্বী গোষ্ঠীর প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হয়েছিল।

তাই এই বহুধাব্যাপ্ত অসন্তোষকে নিয়ন্ত্রণ করা যজ্ঞামূলক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষে ক্রমশ দুরূহতার হয়ে উঠল, তেমনি নব্য চিন্তাধারা দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নগুলির

সমাধান এবং সমাজে অসন্তুষ্ট ও বিচ্ছিন্ন বিরাট অংশের সামঞ্জস্যবিধানও অসম্ভব বিবেচিত হল। ফলে, ধর্মীয় ভাবনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন অনিবার্য হয়ে উঠল। যখন এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হ'ল, বৈদিক ধর্মের দ্বিতীয় প্রধান পর্যায় অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড তখনই আরম্ভ হ'ল।

ব্রাত্যষ্টোমের দ্বারা প্রাগার্য গৃহস্থদের বহু আর্যবৃত্তবহির্ভূত গোষ্ঠী আর্য সামাজিক সংগঠনে একাত্মীভূত হয়েছিল; তেমনি বানপ্রস্থ পর্যায়ের দ্বারা অরণ্যবাসী তপস্বীরা এবং যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যে দিয়ে ভ্রমমাণ ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আর্যসমাজভূক্ত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম যেখানে গৃহস্থদের এবং জৈনধর্ম সন্ন্যাসীদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে ক্যাথলিক ধর্মের মতো প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিন্তু তার অন্তহীন গতিশীল প্রক্রিয়ার দ্বারা আপন পরিধির পরিসর ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করে সর্ববিধ প্রতিবাদী ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও আচরণবিধিকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি অংশে (৮ : ১৫ : ১) প্রথম তিনটি আশ্রম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; আবার ঐ উপনিষদেরই অন্য একটি অংশে (৫ : ১০ : ২, ৩) বিকল্প ধর্মচর্যারূপে অরণ্যে 'শ্রদ্ধা' ও 'তপঃ' নির্দেশিত হয়েছে, যার সাহায্যে যজ্ঞাপরায়ণ গৃহস্থ উন্নততর আধ্যাত্মিক অবস্থানে উপনীত হতে পারেন। এই যুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ক্রমোন্নতি ও সামাজিক প্রাধান্য অর্জন এবং সাহিত্যে অর্থাৎ সমাজে তাদের আদর্শায়িত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রতিফলন লক্ষণীয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাণিজ্য, ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ও রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদ মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্রমাগত বর্ধিত হচ্ছিল। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম–এই দুটি শ্রমণ ধর্ম, যে দুটি সর্বাধিক ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদী শ্রেণীর অর্থাৎ বণিক ও রাজন্যদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার কারণ এদের আদর্শগত প্রয়োজনও ধর্মদুটি দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল। এভাবে নৈতিক ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদকে সামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের

প্রসারিত অভিব্যক্তি এবং জন্মান্তরপ্রাপ্ত সত্ত্বাকে নৈতিক প্রতিরূপ বলে মনে হয়।

দেবসঙ্ঘ (উপনিষদ)

ব্রাহ্মণসাহিত্যের দেবসঙ্ঘ উপনিষদে প্রকৃতপক্ষে একই থেকে গেছে, যদিও দেবতারা পূর্ব পরিচয়ের সারবস্তুর পরিবর্তে নিতান্ত নামটুকুর মধ্যেই পর্যবসিত। কেনোপণিষদ অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রের মতো প্রধান বৈদিক দেবতাদের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে উমা হৈমবতীর মতো পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত দেবীকে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১ : ১ : ১) মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও বায়ুর উল্লেখ পাই। ঐতরেয় উপনিষদের একটি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত কাহিনীতে (১ : ২ : ১-৫) এই তথ্য বিবৃত হয়েছে যে, মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্ত হলে তবে দেবতারাও তাদের প্রাপ্য অংশ লাভ করেন। ঐ উপনিষদের অন্যত্র [৩ : ১ : ৩] প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও মহাভূতসমূহের সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। সুতরাং এই যুগের নব্য ভাবাদর্শ-সম্ভূত নুতন মূল্যবোধ অর্থাৎ প্রজ্ঞার গৌরব বর্ধিত করার জন্য দেবতাদের প্রাচীন মহিমা খর্ব করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ সংহিতা যুগের প্রাচীন ও প্রভাবের দিক থেকে গৌণ দেবতা রুদ্রকে সর্বোত্তম দেবতারূপে উপস্থাপিত করেছে। রুদ্র এখানে সরদপ ঈশ্বরের নামান্তর, কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয়ভাবে তিনি মহর্ষি বলে কথিত, যদিও পূর্বে তিনি পশু ও মানুষের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতেন এবং মঙ্গলময় ও অমঙ্গলময়—এই দুই রূপে তার প্রাচীনতর ভাবমূর্তি সংরক্ষিত। আবার পরম বিশ্বাতিগ সত্ত্বারূপে তাঁর সমুন্নত অবস্থান এখানে ব্রহ্মার সমতুল্য হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু অদ্বৈতবাদী প্রবণতা-সহ একেশ্বরবাদী ভাবনার ক্রমাভিব্যক্তি এই

প্রক্রিয়ার মধ্যে স্পষ্ট : তাই এখানে বলা হয়েছে যে শিবসম্পর্কিত জ্ঞান নির্বাণ ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি দান করে।

দেব-দানব সংঘর্ষের ব্রাহ্মণ্য দেবকাহিনীটি উপনিষদে পুনরাবির্ভূত হলেও এর তাৎপর্য এই পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন; এই সংগ্রাম এখন বস্তুত আধ্যাত্মিক রূপক হয়ে উঠেছে। (যেমন ছান্দোগ্য ৮ : ৭-১২)। দেবতা ও দানব তাই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পরস্পরের প্রতিস্পধী। এই প্রত্নকথার দেবতা ও দানবের মধ্যবতী পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদ ও ভাববাদেব মধ্যবতী পার্থক্যের সমতুল্য; বস্তুবাদকে এখানে মূল্যহীন, সহজ ও অগভীর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, কারণ সম্ভবত সেই যুগে বস্তুবাদী দর্শন কতকটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, যে-ইন্দ্রকে পূর্বে কঙ্গনা জ্ঞানপিপাসুরূপে দেখা যায়নি–এখানে তাঁকে পরম জ্ঞানের অধ্যবসায়ী জিজ্ঞাসুরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সম্ভবত দেবতাদের মধ্যে প্রধান বলেই তিনি জ্ঞানকাণ্ডেও যোগ্য গ্রহীতা বলে বিবেচিত। আবার এই প্রত্নকথায় জনক বা প্রবহন জৈবলির মতো রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় ঋষিদের প্রতীকী বিবরণও নিহিত থাকতে পারে, যাঁরা সে-যুগে নিশ্চিতভাবে বর্তমান ছিলেন–দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ব'লে গণ্য ইন্দ্র সম্ভবত তাঁদের দৈব প্রতিরূপ। এদিক দিয়ে, যাজ্ঞবল্ক্য বা গৌতমের মতো ব্রাহ্মণ দার্শনিকদের দৈব প্রতিরূপ হলেন প্রজাপতি। তৃতীয়ত, একটি বঙ্কিম পথ দিয়ে নিদ্রা, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির স্তর-সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে দেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী ব্যবধানের ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থান রূপে দেখানো হয়েছে—যা-থেকে ক্রমশ এদের পরমাত্মা সম্পর্কে সচেতনতা জেগে ওঠে। আত্মজ্ঞানলিঙ্গলু ব্যক্তিকে ভাবগত উপলব্ধির স্তরে পৌছানোর পূর্বে যে সমস্ত সোপান অতিক্রম করতে হয়-এই কাহিনীতে জ্ঞানই বিবৃত হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই দেবকাহিনী সামান্য পরিবর্তিতরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে এতে আয়স্য অঙ্গিরস অর্থাৎ অথর্ববেদীয় এক পুরোহিত দেবতাদের সর্বোত্তম জ্ঞান শিক্ষা দান করেছেন। এখানে আদিত্যকে সুখ ও বসুকে বায়ুমণ্ডল এবং পৃথিবী, আকাশ, সূর্য, স্বর্গ, চন্দ্র, নক্ষত্র ও রুদ্রকে দশ ইন্দ্রিয়, এবং মন ও ইন্দ্রকে বঞ্জের সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। যজ্ঞবহির্ভুত নৈসর্গিক শক্তি ও উপাদানের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক রচনার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্রুত স্বকীয়মাণ পরিমণ্ডলে প্রাচীন বিশ্বাসকে নূতন জীবনদানের প্রাণান্তিক প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে।

বহুদেববাদ থেকে একেশ্বরবাদ এবং তৎপরবর্তী স্তরে অদ্বৈতবাদ–এই ছিল তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় চেতনার বিবর্তনের প্রক্রিয়া। এভাবে অসংখ্য ঋগ্বেদীয় দেবতা ক্রমশ বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে উত্থিত পরমাত্মার ভাবমূর্তি অর্থাৎ প্রজাপতি, ব্রহ্মণস্পতি, ব্রহ্মা বা পুরুষের মধ্যে বিলীন হয়েছিলেন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাতাবরণেই এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তখনো তারা অস্পষ্ট নবরূপধারী দেবতা রয়ে গেছেন, আহুতি ও প্রার্থনা তাদের উদ্দেশে তখনো নিবেদিত হচ্ছে। সম্ভবত প্রাগার্যদের কাছ থেকে একেশ্বরবাদী ধারণা গৃহীত হয়েছিল; তবে, অন্তত বুদ্ধির স্তরে, তা প্রাচীনতর বহুদেববাদ থেকে স্পষ্টত পৃথক হয়ে পড়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে, ক্রমবর্ধমান যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের শ্বাসরোধিকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বিদ্রোহের ফলেই এই পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। অবশ্য কোনো একজন নির্দিষ্ট বিদ্রোহী ধর্মপ্রবক্তার উল্লেখ করা কঠিন, কেননা ভারতে নব্য চিন্তার বহু প্রবক্তা। এই যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে নানাবিধ বিদ্রোহী মতবাদ প্রচার করেছিলেন; অন্তত, একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাদের ঐক্য ছিল-যজ্ঞধর্মের প্রবল বিরোধিতা। অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল কল্যাণকর আচরণের নির্দেশে নিহিত আদর্শ, চুড়ান্ত সত্যের জন্য বৌদ্ধিক অন্বেষণ এবং কর্ম ও জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস। তবে

নিঃসন্দেহে এই নব্য চিন্তাধারার স্বরূপকে বিবর্তনধারার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত না-করে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অভিব্যক্তি হিসাবে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রাচীন দেবতাদের অস্তিত্ব। তখনো রয়েছে কিন্তু ভক্তদের কাছে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি বহুলাংশে নিস্প্রভ এবং প্রাচীনতর প্রত্নকথাগুলির প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে।

যজ্ঞানুষ্ঠানের নবতর ব্যাখ্যা (উপনিষদ)

এই ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, এই স্তরে যজ্ঞ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল,- তা একেবারেই হয় নি। পূর্ববর্তী যুগে যেমন হচ্ছিল, এখনো প্রায় সমপরিমাণ এবং প্রায় তেমনই সাড়ম্বরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল; শুধু যজ্ঞ সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিচয়নেব মতো কিছু কিছু যজ্ঞানুষ্ঠান এই পর্যায়ে পরোক্ষভাবে প্রশংশিত হচ্ছিল, কিন্তু স্পষ্টতই তাতে নূতন কালোপযোগী ও নূতন প্রয়োজনের আলোকে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি পুনর্বিশ্লেষণ করার প্রয়াস প্রতিফলিত হয়েছে। যজ্ঞসম্পর্কে উপনিষদের ঋষিদের দোলাচলবৃত্তি মুণ্ডক উপনিষদে (১ : ২) অভিব্যক্তি হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম সম্পর্কে প্রাচীনতম উল্লেখে তাকে 'বারংবার জীবনধারণ' না-বলে 'অসংখ্যবার মৃত্যু' বলে বর্ণনা করা হয়েছে; কারণ, মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রণা উদ্বেগের অভিজ্ঞতাই মানুষকে জীবনের গভীর তাৎপর্য অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করেছে—আর, মানুষ তাকেই চূড়ান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করেছ।

আমরা লক্ষ্য করি যে, অধিকাংশ উপনিষদ সংহিতা থেকে বিশেষ কোনো উদ্ধৃতি দেয় নি। এতে প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ সুচিত

হয়েছে; কেননা, গবেষকরা ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্নতা প্রমাণিত করার জন্য চেষ্টা করলেও বৈদিক ধর্মের দুটি প্রধান প্রবণতাকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড রূপে চিহ্নিত করার মধ্যে এই বিচ্ছেদ অভিব্যক্ত হয়েছে–এই তথ্যই স্বীকৃত হয়েছে যে নব্য ধর্মচিন্তা ধীরে-ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে প্রাধান্য অর্জন করছে। এই যুগের ধর্ম হ'ল দেবকাহিনী, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাত্মবিদ্যা, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, লোকায়ত কুসংস্কার, ধর্মানুষ্ঠানে সচেতনভাবে আরোপিত রহস্য, ভাবী শুভাশুভ গণনার তত্ত্ব, ভবিষ্যদবাণী, ঝাড়ফুক, সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস, জাদুপুরোহিতের কার্যকলাপ ও প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে জল্পনা ইত্যাদি। কিছু নতুন মাত্রাও যুক্ত হয়েছে : কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ; জীবন মূলতই অমঙ্গলজনক এমন ধারণা, পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় পরমাত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি। ভিন্ন মাপের সৎকর্মের দ্বারা আনন্দময় লোকের বিভিন্ন স্তর জয় করার বিশ্বাসও ব্যক্ত হয়েছে। সপ্তলোক এভাবে বর্ণিত হয়েছে : নর, পিতৃ, গন্ধর্ব, কর্ম, অজন, প্রজাপতি ও ব্রহ্মা (বৃহদারণ্যক ৪ : ৩ : ৩৩)। পৃথিবীর সঙ্গে অন্যান্য উন্নততর লোকের দূরত্বের উপলব্ধি অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি বিষয়ে নূতন ভাবাদর্শগুলিও এ-সময় দেখা দিতে থাকে।

যদিও প্রত্নকথা ও যজ্ঞানুষ্ঠান—এই উভয়ের মৌলিক চরিত্র এ-সময় যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল তবু নব্য চিন্তাধারার উদ্ভবের যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা কতকটা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় যজ্ঞের পুনর্ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি যে আরণ্যকে নূতন ভাবগত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়; যজ্ঞের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে তা যে কোনো নূতন সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ-এটা প্রমাণের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা সেই আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছিল। এস্তরে বলা হচ্ছে নিহিতার্থ অনুধাবনের জন্য আক্ষরিকভাবে যজ্ঞকে গ্রহণ না ক'রে গভীরতর অতীন্দ্রিয়, প্রতীকী ও

অতিজাগতিক তাৎপর্যের মধ্যে অবগাহন আবশ্যক; সেইসঙ্গে বস্তুজগতের সামগ্রী দিয়ে অনুষ্ঠিত নিছক পার্থিব ক্রিয়া হিসাবে যজ্ঞকে গ্রহণ না করে, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উপকরণ দিয়ে প্রতীকীভাবে অনুষ্ঠিত অতিজাগতিক কর্ম হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন–এ-ধরনের ভাবনা অভিব্যক্তি লাভ করে। তাই, তিনটি যজ্ঞাগ্নি দেহের ত্রিবিধ প্রানবায়ুর সঙ্গে উপমিত হয়েছে (প্রশ্ন ৪ : ৩, ৪); চতুর্বিধ আনুষ্ঠানিক ব্যাহৃতি আহ্বানকে অগ্নি, বায়ু, সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে, তিন বেদকে ত্রিবিধ প্রাণবায়ুর সঙ্গে এবং ব্রহ্মাকে অন্নের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয়েছে (তৈত্তিরীয়, ১ : ৫ : ১)। তেমনি ছান্দোগ্য উপনিষদে বাক ও প্রাণ যথাক্রমে ঋক ও সামের সঙ্গে উপমিত হয়েছে (১ : ১ : ৫)। এ-ধরনের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে |

অথর্ববেদের পুরোহিত ব্রহ্মা, যিনি বিলম্বে রক্ষণশীল যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন—এই পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা অতীন্দ্রিয়ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন আগ্রহের ফলে আনুষ্ঠানিক উপকরণগুলি বারবার বিভিন্ন অতিজাগতিক উপাদানের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। তাই, ইহলোক অগ্নি এবং সূর্য তার ইন্ধন, রশ্মি ধূম, দিন শিখা, চন্দ্র অঙ্গার ও নক্ষত্র স্ফুলিঙ্গ রূপে বর্ণিত (ছান্দোগ্য, ৫ : ৪ : ১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অশ্বমেধ যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গকে অতিজাগতিক উপাদানের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয়েছে (১ : ১ : ১, ২)। এভাবে উপনিষদের যুগে প্রচলিত নিগূঢ় রহস্যবাদী প্রবণতার ফলে অণুবিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে বহুবিধ পরস্পর-সম্পৃক্ত বস্তু-শৃঙ্খলা নির্মিত হয়-মুখ্যত তাদের প্রভাবে অসম্বন্ধ ও বিশৃঙ্খল চিন্তাধারায় দ্রুত প্রসারণ, লক্ষ্যহীন ছদ্ম-আধ্যাত্মিক আলোকদৃষ্টির উৎপত্তি এবং অনিয়ান্ত্রিত দিব্যদৃষ্টির আবাহন ঘটে। এর সাহিত্যিক প্রকাশ প্রায়ই অসন্তোষজনক এবং আমরা প্রকৃত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত অনুসন্ধান রূপেই

এ-সব গ্রহণ করতে পারি। অন্বেষণের ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতার মধ্যে এগুলির সর্বাধিক মূল্য নিহিত; এরূপ নিবিড় আন্তরিকতার মুহূর্তে কখনো কখনো চমৎকার কাব্যিক অভিব্যক্তি দেখা গেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানের পুনর্বিশ্লেষণের এই স্তরে পরবর্তী দিক-পরিবর্তনের পূর্বাভাস সূচিত, যখন অধ্যাত্মবিদ্যা অবশিষ্ট প্রত্নকথার আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে যথার্থভাবে প্রত্নদার্শনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এভাবে উপনিষদের যুগে জ্ঞান নতুন গৌরব অর্জন করে; গূঢ় শক্তিমত্তা ও ফলোৎপাদক ক্ষমতার দিক দিয়ে ক্রমশ তা যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিপূরক হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে জ্ঞান শুধু আধ্যাত্মিক ছিল না, আরো বহুবিধ জ্ঞানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি পাঠ্যসূচীতে (৭ : ১ : ২) তার প্রমাণ রয়েছে : চার বেদ, ইতিহাস, উপাখ্যান, পুরাণ, পিতৃপুরুষের কাহিনী, গণিত শাস্ত্র, শুভাশুভ গণনার বিদ্যা, অর্থনীতি, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বেদান্ত, নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, জীববিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও সাপবিদ্যা। লক্ষণীয় যে, প্রাগুক্ত উপনিষদের অন্যত্র (৫ : ১ : ১-৫) জ্ঞানকে জয় বা প্রাপ্তির সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। বৃহদারণ্যকে জ্ঞানকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে মহিমান্বিত করা হয়েছে (১ : ৪ : ১০) শ্বেতাশ্বতরে বলা হয়েছে যে প্রাচীন জ্ঞান দেবশ্রেষ্ঠ শিব থেকে উৎসারিত হয়েছিল (৪ : ১৮)। বস্তুত এ-যুগে অভিব্যক্ত 'জ্ঞান'-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, জ্ঞান কেবল যজ্ঞের বিকল্প নয়। অর্থাৎ তা শুধু নির্দিষ্ট কিছু প্রাপ্তির অঙ্গীকারই দেয় না, আরো কিছুর সন্ধান দেয়। সংহিতার যুগে জীবনের সারাৎসা এবং লক্ষ্য ছিল দীর্ঘ ও কল্যাণময় জীবনলাভ; কিন্তু উপনিষদের যুগে এই জীবন ও তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক ও অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়েছে। পুনর্জন্ম-সম্ভাবনা অতিক্রমের লক্ষ্য যখন গুরুত্ব লাভ করল, যজ্ঞ তখন তার উপযোগিতা সম্পূর্ণ হারাল এবং জ্ঞান-ই হয়ে উঠলো একমাত্র

যুক্তিসিদ্ধ উপায়। কিন্তু জ্ঞানের লক্ষ্য আবার পরিবর্তিত হয়; বস্তুনিষ্ঠ জগতের জ্ঞান পর্যাপ্ত নয়; শুধু আত্মার প্রকৃত পরিচয় সন্ধান করে এবং জীবাত্মা যে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন নয়এই উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়ে পুনর্জন্মের অভিশাপ অতিক্রম করা সম্ভব।

অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী প্রবণতা

এই স্তরে অতীন্দ্রিয়বাদী উপাদান তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল–আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও পুনর্জন্ম-বন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় রূপে জ্ঞানের উপর সচেতন নির্ভরতা এসেছিল। উপনিষদের যুগে মানুষের জীবনের সমগ্র দিগন্তকে পুনর্জন্মবাদ ও কর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিয়েছিল; এইসব নতুন ভাবাদর্শের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে গিয়ে মানুষ তখন প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল–কেননা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও প্রাপ্তির উপায়সমূহের উপর এদের প্রচণ্ড প্রভাব তখন অনস্বীকার্য। ইন্দ্রজালের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় উপাদানের ঐতিহ্য থেকে যজ্ঞধর্মে গৃহীত অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতা ছিল সমাদৃত, ও নতুন বোধের সহায়ক; যেমন, সামমন্ত্র রচনার সৃষ্টিশীল প্রেরণারূপে সোম নির্দেশিত হয়েছে (বৃহদারণ্যক, ১ : ৩ : ২৪)। এমন কি, আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিনিষ্ঠ দ্বান্দ্বিক বিতর্কেও চূড়ান্ত পর্যায়ে অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট (যেমন, তদেব ৩ : ২ : ১)। উত্তর লাভের চেয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের তাৎপর্য অনেক বেশি; মৃত্যুবোধের পর্যাপ্ত অভিব্যক্তির মধ্যে সেই যুগের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে (তদেব, ৪ : ৩ : ৬)। বহুস্থানে পরমাত্মার নিগূঢ় স্বভাব ও ক্রিয়াকলাপ অতীন্দ্রিয় ভাবনার পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এই বিষয় বুদ্ধিগম্য নয়, কেবল অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি

দিয়ে প্রাণিধান করা যেতে পারে (যেমন, তদেব, ৪ : ৩ : ১৪; কঠ, ১ : ২ : ১২, মুণ্ডক ৩ : ২ : ৩; শ্বেতাশ্বেতর ৩ : ১৪, ১৯, ২০ ইত্যাদি)।

আত্মা ব্রহ্মের দুর্জ্ঞেয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার অন্যতম পরিচিত পদ্ধতি হ'ল সমস্ত মহাভূত, সূর্য, প্রজাপতি, বর্ষ, দিবা, রাত্রি, অন্ন ইত্যাদির সঙ্গে তার একাত্মতা ঘোষণা (প্রশ্ন, ১ : ৩-১২)। আবেকটি সাধারণ পদ্ধতি হ'ল তাকে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ একাক্ষর 'ওম'-এ (মুণ্ডক, ১ : ১ : ১; তৈত্তিরীয়, ১ : ৮) কিংবা তিনটি পবিত্র অক্ষর 'ভু, ভুবঃ, স্বর'-এর পরিণত করা (তৈত্তিরীয় ১ : ৬ : ২)। এভাবে যজ্ঞের বিভিন্ন উপকরণকে বা মন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানকে নানাবিধ অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য মণ্ডিত করা হয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনাও অনুরূপ অতীন্দ্রিয় কল্পনাকে আশ্রয় করেছে। এভাবে অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবনা যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতীকী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে; এ ধরনের পুনর্বিশ্লেষণ উপনিষদের যথার্থ আধ্যাত্মিক মতবাদ নির্মাণের পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় স্তরটি গঠন করেছে। অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতা ব্যতীত কোনো ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, কয়েক শতাব্দীর প্রত্নপৌরাণিক চিন্তাভাবনা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের পরে বিমূর্ত ভাবনার অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত পরিমণ্ডলে আকস্মিক উল্লম্ফন প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। তাই, অব্যবহিত পরবর্তী স্তরে অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতার ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়; তখন প্রত্নকথাগুলিকে প্রতীকী অতিজাগতিক ও প্রত্ন-আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যা করে আনুষ্ঠানিক ধর্মকে উচ্চতর স্তরে দীর্ঘস্থায়ী গ্রহণীয়তা দিতে চেয়েছে। এই পর্যায়ের পরেই শুধু পরবর্তী দুঃসাহসী পদক্ষেপ সম্ভব, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্মকে সম্পূর্ণ অ-পর্যাপ্ত, এবং ফলত, অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত প্রত্নকথা-বর্জিত আধ্যাত্মিক চিন্তার স্তরে উপনীত হওয়া। ইন্দ্রজালে বিশ্বাস দুজ্ঞেয় রহস্যময় প্রবণতার সহগামী ও তার ভিত্তিভূমি; ক্রমশ তা আধ্যাত্মিক পরিশীলনের ফলে দুর্বলতর হ'ল, যেহেতু তা বুদ্ধিবৃত্তিকে

উপযুক্ত উপকরণরূপে গ্রহণ করে ধীরে-বীরে তারই উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো।

বাস্তবতার সম্বন্ধে উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গি কতকটা বিশ্লেষণী বুদ্ধি-প্রসূতী; বেশ কিছু প্রচলিত সাধারণ ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য এই সত্যকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হবে। এ-ধরনের ভুল ধারণাগুলির মধ্যে প্রধান হল শংকরাচার্যের উপনিষদ-ভাষ্যকে অভ্রান্ত পদ্ধতি ব'লে মনে করা। এটা অনৈতিহাসিক এবং সম্পূর্ণ ভুল; কারণ, উপনিষদ রচিত হওয়ার প্রায় পনেরো শ' বছর পরে শংকর জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই অন্তর্বর্তী শতাব্দীগুলির মধ্যে উদ্ভূত পূর্ণাঙ্গ অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা-প্রসূত দার্শনিক মতবাদ দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার নিজস্ব উদ্দেশ্যের উপযোগীরূপে ও আপন মতবাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে উপনিষদগুলিকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। উপনিষদগুলি যখন যেভাবে রচিত হাে্ক না কেন, নিজেরা কোনো সুস্পষ্ট প্রণালীবদ্ধ দার্শনিক লক্ষ্যযুক্ত পদ্ধতি তৈরি করার চেষ্টা করে নি। এর একটা কারণ এই যে, অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতার আতিশয্য তখনো এদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছিল বলে সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ অ র স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করা সম্ভব ছিল না; এ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু আংশিকভাবেই গভীর চিন্তাপ্রসূত। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ঋষি উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচনা করেছিলেন বলে তাদের মধ্যে পরস্পর-ভিন্ন, এমনকি কখনো-কখনো পরস্পরবিরোধী উপলব্ধিও প্রতিফলিত হয়েছে। এই রচনাংশগুলি যে একত্র সন্নিবিষ্ট হতে পেরেছিল, তার পেছনে রয়েছে একটি নেতিবাচক ও একটি ইতিবাচক কারণ। নেতিবাচক কারণটি হ'ল, আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মূল তাগিদ এবং ইতিবাচক কারণ হ'ল, তাদের অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়বস্তু অর্থাৎ মানুষ, মন, বস্তু, আত্মা ও পরমাত্মার তাৎপর্য উপলব্ধি।

সংহিতার সর্বেশ্বরবাদ থেকে ব্রাহ্মণ যুগের অন্ত্যপর্বের প্রজাপতিকেন্দ্রিক একেশ্বরবাদের মধ্য দিয়ে উপনিষদের ব্রহ্ম-ভাবনার অদ্বৈতবাদে চরম পরিণতি লাভের বঙ্কিম পথটি দীর্ঘ ও গ্রন্থিল। এর মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের উৎথান-পতন ও সংঘর্ষের বিবিধ স্তর প্রতিফলিত হয়েছে। কেনোপনিষদের একটি বিখ্যাত উপাখ্যানে দেবতারা রহস্যময় বস্তুর আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে উমা হৈমবতী জানালেন, ইনিই ব্রহ্মা। এখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঋষির দিব্যদর্শনকে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তির প্রক্রিয়া হিসাবে করা হয় নি। কঠোপণিষদে আত্মাকে রথী, দেহকে রথ, ইন্দ্রিয়কে অশ্ব, বুদ্ধি সারথি এবং মনকে রথরশ্মিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১ : ৩ : ৩-৪)। সাংখ্যাতত্ত্বের পূর্বসূরী হিসেবে শ্বেতাশ্বেতর মহেশ্বরকে অতিজাগতিক মায়ার নিয়ন্তা ও শ্রেষ্ঠ প্রভুরূপে বর্ণনা করেছে; প্রকৃতি হ'ল মায়া এবং মহেশ্বর থেকে উদ্ভূত সহায়ক শক্তিগুলি সমগ্র বিশ্বজগৎকে আবৃত করেছে। (৫ : ৩)। পুরুষ ও প্রকৃতি সম্মিলিত হওয়ার পরে বিবর্তনময় সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হয়। এই উপনিষদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে একেশ্বরবাদী প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছে; ষষ্ঠে মহেশ্বর পরমাত্মা রূপে গৃহীত। তাছাড়া পরবর্তী বেদান্তদর্শনে প্রবল-প্রভাবে যে মায়াবাদ শ্বেতাশ্বেতরেই তার প্রথম দেখা মেলে।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্ম-ব্রহ্মা তত্ত্ব চূড়ান্ত ও সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত রূপ পরিগ্রহ করে। মানবিক সারাৎসার সম্পর্কে ভাববাদী বিশ্লেষণ অজার ও অমর আত্মা সম্পর্কিত ধারণার পর্যবসিত হয় (যেমন ছান্দোগ্য, ৬ : ১১ : ৩; ৮ : ১ : ৬ ইত্যাদি)। আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে দেখানোর প্রবনতার ভাববাদী দর্শনের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। পরবর্তী উপনিষদগুলিতে দেহ ও আত্মার পার্থক্য স্পষ্টতর হয়ে অবিসংবাদী ভাববাদী দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বস্তুবাদী চিন্তাধারার অবশেষও রয়ে গেছে (যেমন,

ছান্দোগ্য, ১ : ২ : ২-৭; ৩ : ১৪ : ৩ ইত্যাদি)। দেহ ও আত্মার দ্বৈতবোধ এই উপনিষদে অভিব্যক্ত : 'মৃত্যু গৃহীত এই শরীর মরণশীল হলেও এতেই অমর ও দেহহীন আত্মার অবস্থান' (তদেব, ৮ : ১২ : ১)। ফলে এই শরীরের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবের সূত্রপাত হ'ল; নানাবিধ পাপ ও অকল্যাণের অধিষ্ঠানরূপে দেহ বিভিন্ন উপনিষদে নিন্দিত হয়ে দেহবিচ্ছিন্ন নিরুপাধি নিরঞ্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মার ধারণা বৃহদারণ্যকে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল। যাজ্ঞবল্ক্যের তত্ত্ব দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি যুগের সমাপ্তি ও পরবর্তী আবির্ভাব সূচনা করেছে—যে-যুগ প্রকৃতপক্ষে এখনো পর্যন্ত অব্যাহত। (তুলনীয় বৃহদারণ্যক, ১ : ৪ : ১; ১ : ৪ : ৮; ২ : ৩; ৩ : ৪ : ২)। নতুন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধ দৃঢ় ও নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত যে, উপনিষদের প্রাগুক্ত প্রধান মতবাদে সমন্বিত হওয়ার পূর্বে দুটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সন্ধানের ধারা প্রবাহিত ছিল। একদিকে, সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আত্মা সম্পর্কে দীর্ঘায়িত অনুসন্ধান নিশ্চিতভাবে চলছিল, যেহেতু শরীরের ধ্বংস অনিবার্য এবং মরণশীল মানুষ সাগ্রহে জানতে চাইছিল, মানুষের কোনো উপাদান মৃত্যুকে অতিক্রম করে কিনা। দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বপ্নমায়া ও বিভ্রম এবং সেই সঙ্গে জীবনের নেতিবাদ বা বিনাশ অর্থাৎ মৃত্যুকে স্বীকার করার প্রতি স্বাভাবিক অনীহা থেকেই অমর আত্মার অস্তিত্ব-সম্পর্কিত বিশ্বাস জন্ম নেয়। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মানুষের একমাত্র যোগসূত্র হ'ল আত্মা, কারণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় চিন্তা, অনুভব বা আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না–তাদের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আত্মাই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ। (বৃহদারণ্যক, ২ : ৪ : ১৪; ৩ : ৪ : ১-২)।

তত্ত্ব সন্ধানের ধারা শুরু হয়েছিল বস্তুবিশ্বের সারাৎসার এবং পরমাত্মার সঙ্গে তার যোগসূত্র অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে। এই দীর্ঘায়িত তত্ত্ব সন্ধানের ধারার শুধু কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অংশ আমাদের নিকট উপনীত হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম চিরন্তন আত্মারূপে অবিহিত যে ব্রহ্মা তার সম্পর্কে ধারণার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। বস্তুত তত্ত্ব সন্ধানের এই দুটি ধারার চিহ্ন দুটি শব্দের বুৎপত্তিতে নিহিত। কেননা একদিকে 'আত্মা' শব্দটি সম্ভবত প্রাণবায়ু থেকে নিষ্পন্ন (তুলনীয় জার্মান "আম্মেন', অর্থ) নিঃশ্বাস নেওয়া এবং অন্যদিকে 'ব্রহ্ম' শব্দের মধ্যে বিপুলতার ধারণাটি প্রচ্ছন্ন যেহেতু 'বৃহৎ' শব্দের সঙ্গে তার বুৎপত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে,–এতে বোঝা যাচ্ছে যে এ তত্ত্ব সন্ধানের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল বিশ্বজগৎ।

অনুসন্ধানের প্রথম ধারাটি প্রসঙ্গক্রমে দৈহিক জীবনের ধারণা অর্থাৎ প্রাণ সম্পর্কেও গবেষণা করেছে। বহু রচনাতে প্রাণ ও আত্মা-শব্দ দুটি সহগামী ও পরস্পর বিনিময়সহ তত্ত্ব। শরীরের প্রতিটি প্রধান ক্রিয়াশীল অংশের একটি করে প্রাণ কল্পিত হয়েছে, সম্ভবত এই ধারণা থেকেই পরবর্তীকালে প্রাণ সম্পর্কিত অনেকত্ববাদী ধারণার সৃষ্টি হয়। তবে, সাধারণত উপনিষদে প্রাণ একক (তুলনীয় মুণ্ডক ৩ : ১ : ৪, তৈত্তিরীয় ২ : ২ : ৩)। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বিখ্যাত কাহিনীতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় প্রাণের নিশ্চিত প্রাধান্য ও অপরিহার্যতা ব্যক্তি হয়েছে (১ : ৩ : ১১)। প্রাণের অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা বহুস্থানে যায়। আত্মানুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় দেহ ও মনের প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ, পরিধি, সীমা ইত্যাদি আলোচিত হওয়ার ফলে এর মধ্যে আমরা শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের কিছু আভাস পাই। মানুষের মধ্যে যে অবিনশ্বর উপাদান দৈহিক মৃত্যুর ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে গিয়ে নিদ্রা, স্বপ্ন ও স্বপ্নহীন সুষুপ্তির মৃত্যুতুল্য পর্যয়গুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল (বৃহদারণ্যক,

২ : ১১ : ১৫-২০, মাণ্ডুক্য, ৩ : ৭)। পরবর্তী স্তরে উদ্ভূত হ'ল এই বিশ্বাস-লালিত সিদ্ধান্ত যে, শরীরে প্রাণবায়ু-সঞ্চরণকারী ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকারয়িতা শক্তি মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে। এই আত্মা জীবনদায়ী প্রাণবায়ুর প্রেরয়িতা, অন্তরতম এবং পুত্র, ধন ও অন্যান্য সমস্ত কিছু অপেক্ষা প্রিয়তর (বৃহদারণ্যক, ৩ : ৪ : ১; ৪ : ১৬, ১৭; ১ : ৪ : ৭)। জীবনীশক্তিকে যখন আত্মার সঙ্গে একাত্মীভূত করা হ'ল, আত্মানুসন্ধানের এই ধারা তখন তার সমাপ্তি-বিন্দুতে উপনীত হ'ল।

অনাত্মের রহস্যজনক জগতের জন্য অনুসন্ধানের অপর ধারাও ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ পথ পরিক্রম করেছিল। আমরা, দেখি যে, মধ্যপথে তা নিজেকে অতিজাগতিক উপাদানসমূহের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে একাত্ম করে নিয়েছিল। মহাবিশ্বের বিস্ময়কর বিশালতা—বিশেষত আকাশমণ্ডল ও মহাশূন্যের ব্যাপ্তি খুব সম্ভবত ব্রহ্মবিষয়ক ধারণার প্রথম বস্তুগত ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিল। বারংবার ব্যবহৃত আলো উজ্জ্বলতা, পুত্র, স্বর্ণ (অর্থাৎ সূর্য) নির্মল মহাশূন্য (বিরাজা) ধবলতা, অপ্রাপণীয় উচ্চতা সর্বব্যাপ্ত পরিসর যার পরে আর কিছু নেই–ইত্যাদি অনুষঙ্গ থেকে এই ব্রহ্ম ধারনার সমর্থন পাওয়া যায়। ব্রহ্মের এই সীমাহীনতা থাকে চূড়ান্তভাবে বোধ্যাতীত করে তুলেছে; কোনও সংজ্ঞার্থের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করা যায় না। ব্রহ্ম সমগ্র সৃষ্টির চূড়ান্ত আশ্রেয়, সীমাহীন মহাবিশ্বের বিমূর্ত প্রকাশ, মৃত্যু ও বিনাশের অতীত এবং তাই বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ।

উপনিষদীয় চিন্তাধারা তার শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল, যখন সসীম আত্মার মৌল স্বরূপ এবং এই বস্তুগত জগতের পশ্চাদবর্তী বাস্তবত অথাৎ ব্রহ্ম সম্পর্কিত দুটি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত এক ও অভিন্নরূপে উপলব্ধ ও ঘোষিত হ'ল। আমাদের বাহিরে ও ভিতরে একই বস্তু বিরাজমান; এই দুয়ের মধ্যে যারা

ভিন্নতা দর্শন করে, তাদের দৃষ্টি বিকৃত এবং সেই ক্লিষ্ট ও ভীতিসকুল দৃষ্টির কাছে বাস্তবতা খণ্ডিত ও বহু ব'লে প্রতিপন্ন হয়। একমাত্র একত্বের উপলব্ধি মুক্তি-বিধান করতে সমর্থ যা বাক বা বুদ্ধি অনুধাবন করতে পারে না। আনন্দরূপে যখন তা উপলব্ধ হয়, কেবন তখনই ভয় ও উদ্বেগ থেকে নিশ্চিত মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আত্মা ও ব্রহ্মের এই একত্ববোধের প্রক্রিয়া প্রাচীনতর উপনিষদগুলিতে শুরু হয়েছিল এবং এই প্রবণতা উপনিষদকে আরণ্যক থেকে পৃথক করেছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যস্তরে ভারতবর্ষে ব্রহ্মা ও আত্মার এই আপাত-সরল সমীকরণের প্রবল প্রভাব অনুভূত হয়েছিল, কারণ তা একটি বিশাল ব্যাপ্তিযুক্ত সামাজিক সমস্যার ভাগবত অনুবন্ধ নিমাণ করতে চেয়েছিল। এই সমস্যা ছিল গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমন্বয়ের সমস্যা। প্রাগ্বৈদিক, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও বিভিন্ন অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহু শতাব্দীব্যাপী সংঘর্ষ ও আর্যীকরণের যুগে যে জটিল ও বহুস্তর-বিন্যস্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া চলছিল, তার অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে এমন একটি আধ্যাত্মিক প্রত্নকথার সৃষ্টি হল, যা বিচ্ছিন্নতা বা বিভাজনের পরিবর্তে সংশ্লেষণী ও সর্বাত্মকতার প্রবনতাকে অভিব্যক্ত করেছে।

আত্মা ও ব্রহ্মের একাত্মবোধের ধারণায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্যবোধের সম্ভাবনায় সমুন্নতি লাভ করল; এতে শুধু অনার্য জনগোষ্ঠীর অহংবোধ যে তৃপ্ত হ'ল তা নয়, প্রাগার্য প্রতিবেশীকে শ্রদ্ধা এবং এমনকি, ঘনিষ্ঠতার বোধ গ্রহণ করতে শিখল। বিকাশোন্মুখ মিশ্র জনগোষ্ঠী পরস্পরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমর্থনে তাত্ত্বিক যুক্তি পেয়ে গেল। অবশ্য এর অর্থ এই যে, এ সমস্তই কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছিল; প্রকৃতপক্ষে সেযুগের আধ্যাত্মিক অভিভাবকরা একটি বিশাল ও বিকাশমান জনগোষ্ঠীর সামাজিক কল্যাণের জন্য উপযুক্ত তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিল। 'বৃহৎ' শব্দনিষ্পন্ন 'ব্রহ্ম' স্বাভাবিকভাবেই ছিল একটি

ব্যাপক ভাবাদর্শ,–কোনও ব্যক্তি যদি কাল্পনিকভাবেও নিজেকে তার মধ্যে স্থাপিত করতে পারে, সমগ্র মানবজাতির জন্য সে এর মধ্যে আধ্যাত্মিক আশ্রয় খুঁজে পায়। অন্যদিকে আত্মতত্ত্ব আংশিকভাবে মানুষের অন্তিম ভয় অর্থাৎ মৃত্যুর ফলে বিনাশের ভয়কে একটি নৈর্ব্যক্তিক স্তরে সমাধান করেছিল।

ব্যক্তির মৃত্যু হলেও মানবজাতির মৃত্যু হয় না; যখন কোনো ব্যক্তি নিজের সীমাবদ্ধ মরণশীল অস্তিত্বকে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে মানবজাতির অমর আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে পারে, যা মৃত্যুহীন অসীম আত্মা–তখন সেই ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত দেহাবসানের পরেও জীবনের নিরবচ্ছিন্নতার আশ্বাস পেয়ে নিরাপদ বোধ করে। সুতরাং এ-দুটি ভাবাদর্শের সম্মিলনের ফলে অন্তত ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবত, বিশেষভাবে বর্ণ-বিন্যস্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমসাময়িক সমাজ তখনো মন্দভাগ্যদের নিপীড়ন করছিল, নানাবিধ যজ্ঞ তখনো অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, পুরোহিতরা পূর্ববৎ লোভী ছিল, যদিও জনসাধারণের একটি অংশ প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে ক্রমশ অধিকতর বিক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে উঠেছিল, সমাজের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ তখনও পর্যন্ত অভ্যস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মের মাধ্যমে তাদের বিক্ষুব্ধ ধর্মীয় বিবেকের সমাধান সন্ধান করছিল। সেই মুহূর্তে সামাজিক স্তরে খুব সামান্য বস্তুগত অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব ছিল, তবে ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্বের মধ্যে এমন একটি যুক্তিসিদ্ধ সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল, যা সামাজিক বাস্তবতাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়ে বহু সম্ভাব্য শত্রুতা ও রক্তপাতের আশঙ্কাকে প্রতিহত করেছিল। বিশ্বজগতের মৌল স্বরূপ ও উৎপত্তি, তার বিভিন্ন উপাদান এবং মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কে উৎসাহ এই যুগের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ, তবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মতো এখানেও বিভিন্ন প্রত্নকথার মধ্যে কোনো সাযুজ্যবোধ নেই। মুণ্ডক উপনিষদের মতে অক্ষর থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছিল–একধরনের বিবর্তনের ক্রম-অনুযায়ী প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ,

আকাশ, বায়ু, আলো ও জল উদ্ভূত হয়েছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ক্রম সামান্য পরিবর্তিতভাবে আত্মা থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন প্রত্নকথায় দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বগত বাস্তবতার মূল উৎসরূপে বিভিন্ন সারবস্তুকে নির্দেশিত করা হয়েছে। সে সময় বহু আঞ্চলিক রূপভেদ ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের বহুস্তরযুক্ত অভিব্যক্তি-সহ যেসব সৃষ্টিতত্ত্ব জনমানসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, সেগুলিকে সংহত করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই ঐ প্রবণতার কারণ। এভাবে একটি বিবর্তন-নির্ভর ভাবনির্মাণে পরস্পর বিপরীত সৃষ্টিতত্ত্বগুলিকে সন্নিবেশিত করে তাদের চূড়ান্ত রূপদানের চেষ্টা হয়েছে। (যেমন তৈত্তিরীয় ২ : ৬, ৭; ঐতরেয় ১ : ১ ১-৪, ১২; ছান্দোগ্য ৩ : ২১ : ২, ৪ : ১৭ : ১৩; বৃহদারণ্যক ১ : ২ : ৫ ইত্যাদি) পরবর্তী উপনিষদগুলিতে সৃষ্টির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। পরমাত্মার সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা ও সৃষ্টির প্রয়োজনে তপস্যায় নিরত হওয়ার বৃত্তান্ত বহু প্রত্ন-কথায় পাওয়া যায়। সৃষ্টিশীল শক্তি, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও সৃষ্টির পশ্চাদবর্তী সক্রিয় মহাশক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্নকথায় ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ রয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি কাহিনীতে মানবজীবনের একাকিত্বের অনুভূতি, সঙ্গিনীর আকাঙ্ক্ষা, নারীপুরুষের মিলন ও সন্তান উৎপাদনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল ভাবনাকাব্যিক অভিব্যক্তি পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, মরণশীল মানুষকে সেখানে মৃত্যুহীন দেবতার স্রষ্টারূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১ : ৪ : ৬), যাতে উপনিষদীয় ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে।

চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য আধ্যাত্মিক সন্ধানের অন্য মেরুতে রয়েছে প্রেততত্ত্ব; সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের পরিপূরক। সংহিতা সাহিত্যে এই বিষয়ে ভাবনার সূত্রপাত হলেও পরবর্তী অধ্যায়েই তা নিজস্ব চরিত্র অর্জন করে। এই তত্ত্ব সন্ধানের সূচনা-বিন্দুতে রয়েছে মানুষ ও মানুষের মরণোত্তর ভাগ্য। জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু যে মৃত্যু, তার সম্পর্কে চেতনা অধিকাংশ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সূচনা-বিন্দু এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রধান

সমস্যার কেন্দ্র। তবে, মৃত্যুকে জয় করা অর্থাৎ দৈহিক মৃত্যুর পরেও জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা স্থাপনই একধরনের ভাবনার প্রকৃত উদ্দেশ্যে। তাই গ্রিক, ইহুদী ইরাণীয় এবং অন্যান্য দেশের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদগণ এ-বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তাবিষ্ট হয়েছিলেন। প্রত্যেক উপনিষদ পৃথকভাবে এই সমস্যা আলোচনা করে নিজস্ব উপায়ে সমাধান উপনীত হতে চেয়েছে; এইসব সমাধান আবার একটি বিন্দুতে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে : তা হল ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানই পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি দেয়। ঈশ ও কঠোপনিষদে নিরানন্দময় অন্ধকারে আবৃত মৃত্যুলোকের বর্ণনা আমাদের চোখে পড়ে। বিভিন্ন উপনিষদে এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছেঃ দেহ বিনষ্ট হওয়ার পর মানুষের কী অবশিষ্ট থাকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে আত্মা অবশিষ্ট থাকে (কাঠ ২ : ২ : ৪)। এই উপনিষদে পুনর্জন্মতত্ত্ব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এধরনের প্রশ্ন ও মীমাংসা আমরা 'কেন" এবং প্রশ্নোপনিষদেও লক্ষ্য করি। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিখ্যাত দেবযান ও পিতৃযান তত্ত্বের প্রাথমিক আভাস রয়েছে মুণ্ডকোপনিষদে (১ : ২ : ১১)। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ধারণাকে আরও বিশদ করা হয়েছে। তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে প্রেততত্ত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। শেষোক্ত উপনিষদে বলা হয়েছে যে, মানুষের আপন কর্ম অনুযায়ী তারা আত্মা বিভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে (৫ : ১১ : ১২)। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই পর্যায়ে কর্মবাদ পুনর্জন্মতত্ত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, দেহান্তরবাদতত্ত্ব ক্রমশ একটি যুক্তিসিদ্ধ-ভাবসংগঠনের মধ্যে বিন্যস্ত হচ্ছিল।

অন্য উপনিষদগুলির তুলনায় ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে অধিক আলোচনা করে আমাদের কাছে অনেক বেশি তথ্য উপস্থাপিত করেছে। বলা হয়েছে যে, কোনও মানুষ তার প্রাক্তন জন্মে অর্জিত কর্মফল অনুযায়ী ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়,বৈশ্য, কুকুর, শূকর বা চণ্ডালরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে (৫ : ১০ : ৭); এমনকি, স্বর্গ ও চিরস্থায়ী সুখের নিকেতন নয়, কর্মফলের শক্তি ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে আত্মাকে নির্বাসিত হতে হয় (৮ : ১ : ৬)। মরণোত্তর আত্মার বিভিন্ন অবস্থান, ভিন্ন ভিন্ন লোক এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বর্ণনা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে লক্ষ্য করা যায়।

.

নতুন উপাসনা পদ্ধতি : প্রশ্ন ও সংশয়

প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদরা যখন বিশ্বজগৎ ও ব্যক্তির স্বভাববৈশিষ্ট্য ও সারবস্তুর সন্ধান করছিলেন, সম্প্রসারণশীল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার ব্যবহার তখন আর কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বহু লোকপ্রিয় অবৈদিক ও প্রাগার্য উপাসনা পদ্ধতি ও পরমাত্মা সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত আচার ব্যবহারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ভাবাদর্শ হ'ল তপঃ-বহু উপনিষদের মধ্যে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ ছড়িয়ে রয়েছে। সংহিতা ধর্মযজ্ঞবিষয়ক সামূহিক অনুষ্ঠান পরিচালনার বিদ্যা সম্পর্কে অবহিত ছিল, কিন্তু এই পর্যায়ে তপঃ আত্মোপলব্ধির বহুজন-গ্রাহ্য পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। তাই, মুণ্ডক উপনিষদ বলেছে যে, তপস্ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মাকে লাভ করা যায় (১ : ১ : ৮)। যখন কীেম সমাজ এবং ঐন্দ্রজালিক ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষা বিলীন হওয়ার ফলে নিরাপত্তার অভাববোধ সর্বত্র পরিব্য, ও হয়ে পড়ছিল, সম্ভবত সেই পরিবেশেই নতুন উপাসনা পদ্ধতি অর্থাৎ যোগসাধনচর্যার উদ্ভব ঘটেছিল। হয়ত বা এই ভাবাদর্শ প্রাগার্য প্রভাবের ফল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মূল্যবোধ যোগচর্যার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছিল; সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার প্রাপ্ত প্রত্ন-পশুপতি মূর্তির মধ্যে তার প্রথম

প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সংহিতায় এই ভাবনার সঙ্গে তুলনীয় কিছু নেই, যদিও যতিদের সঙ্গে ইন্দ্রের শত্রুতাবিষয়ক উপাখ্যানে একটি ভিন্ন ধরনের ধর্মচর্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিংবা 'মুনি' বলে পরিচিত ভিক্ষাজীবী ও মৌন ব্রতধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিম মানুষের বিচিত্র ধর্মচর্যার ইঙ্গিত রয়েছে। ছান্দোগ্য ঐ পনিষদে যোগসাধনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কঠোর বিধিসমূহের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে ব্রহ্মচর্যাকে উপবাস পালনের সঙ্গে একীভূত করে দেখানো হয়েছে। সম্ভবত, এতে অবৈদিক ভাবাদর্শ দ্বারা বৈদিক ধর্মচিন্তা প্রভাবিত হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে যোগসাধনার নানাবিধ অনুপুঙ্খ উল্লিখিত হয়েছে।

যোগ ছাড়াও ভক্তির প্রাথমিক পর্যায়ের নিদর্শন আমরা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে লক্ষ্য করি, যেখানে মহেশ্বরের প্রশস্তির মধ্যে পরবর্তী পৌরাণিক যুগের সম্প্রদায়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাভাস পাওয়া যায়; মুণ্ডক উপনিষদে গুরুবাদ, কর্মবাদ ও যজ্ঞধর্মের তাৎপর্যহীনতা আভাসিত হয়েছে। অর্বাচীনতর শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে এই ধারণাগুলি যেমন আরও বিস্তার লাভ করেছে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ মানবজীবনের পরম লক্ষ্যরূপে সেখানে ঘোষিত হয়েছে!

প্রকৃতপক্ষে প্রায় সবগুলি উপনিষদ এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছে, যা তৎকালীন জনসাধারণের চিন্তাশীল অংশকে সংশয়-প্রস্ত করে তুলেছিল। আমরা সেযুগে অনুষ্ঠিত বহু আধ্যাত্মিক আলোচনা চক্রের ব্রহ্মোদ্যের বিবরণ এবং বহু আরণ্য শিক্ষা নিকেতনের নিদর্শন পাই, যেখানে কিছু কিছু মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় সমাধানের পথ সন্ধান করা হত। এমনকি, যেখানে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি, সেসব রচনাকেও কোনো মৌলিক সমস্যার প্রতি আলোকপাতের প্রয়াসরূপে গণ্য করা হত, সমাধানগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারি।

কঠোপনিষদের বিখ্যাত নচিকেতা-উপাখ্যানে মানুষের মরণোত্তর অবস্থা সম্পর্কে যে সংশয় ব্যক্ত হয়েছে, তাতে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষে প্রেততত্ত্ব সংশ্লিষ্ট প্রাচীন সংশয়ই অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সমগ্র প্রশ্নোউপনিষদ প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন জিজ্ঞাসুদের মনে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন ও সমাধানের সমষ্টি। এ সবের মধ্যে অরণ্যের আশ্রমগুলিতে তৎকালীন বিদ্যাচর্চার পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে। এই উপনিষদ থেকে এই তথ্য স্পষ্ট যে, সেসময় প্রধান তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জীবনের উৎস, সারাৎসার, ক্রিয়া, পরিধি ও সমাপ্তি ছাড়াও জীবনের মূলাধার আত্মাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও মরণোত্তর অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। আবার, প্রায় সমগ্র ছান্দোগ্য উপনিষদে দ্বান্দ্বিক আঙ্গিকে অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পর্কিত বিশেষ জিজ্ঞাসা ছাড়াও কিছু কিছু ব্যবহারিক ও পার্থিব প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক সমস্যা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মৌলিক সমাধান সম্ভবত বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়, যেখানে উপনিষদের আদর্শবাদ তার শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছে। এই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত সংলাপ ছাড়াও অশ্বলের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন তৎকালনী তত্ত্ব জিজ্ঞাসার স্বরূপ আভাসিত হয়েছে। এই উপনিষদে মৃত্যু, অতিজাগতিক উপাদান ও আত্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। উদালক ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন এবং গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিখ্যাত বিতর্ক তৎকালীন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার অসামান্য পরিচয় বহন করছে। মৃত্যু ও পুনর্জন্ম সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ গৃহীত হওয়ার পূর্বে যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে। প্রেততত্ত্ব বিষয়ক কিছু কিছু সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হয়নি। জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য এবং প্রবহন ও শ্বেতকেতুর সংলাপে আত্মতত্ত্ববিষয়ক সূক্ষ্ম ও বিশদ চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন উপনিষদে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা সেইযুগের প্রধান বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হই; মৃত্যু, মৃত্যুর পরে মানুষের ভাগ্য,

বস্তুগত বিশ্বজগৎ ও মানুষের আপনি আত্মার নিগূঢ় স্বভাব, মৃত্যুর পরে মানুষের কর্মের সঙ্গে তার ভাগ্যের সম্পর্ক এবং পুনর্জন্ম থেকে পরিত্রাণ ও চূড়ান্ত মুক্তিলাভের উপায়।

পুনর্জন্ম ও মুক্তি (উপনিষদ)

ঋগ্বেদের মানুষের কাছে এই পৃথিবীর জীবন ছিল মধুর আশীর্বাদ, তাই একটি সমস্যামুক্ত সমৃদ্ধ জীবনকে মৃত্যুর পরেও সম্প্রসারিত ও দীর্ঘায়িত করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু উপনিষদে জীবন এমন অমঙ্গলে পরিণত যে, পার্থিব অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি এখন ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে, পুনর্জন্মকে অতিক্রম করাই ধর্মের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত-সম্ভবত এই মতবাদ প্রাগার্য তপস্বী সম্প্রদায়দের (যেমন–মুনি যতি ও শ্রমণ) মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। তৎকালীন মানুষ জীবনের পুনরাবৃত্তি এবং মৃত্যুর পরে পুনরুদ্ভবের প্রক্রিয়া চন্দ্র, উদ্ভিদ ও জীবজগতের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখেছিল; কিন্তু মৃত্যুর পরে জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে প্রবল বিশ্বাস থাকায় মানুষের কাছে তা অবিমিশ্র অভিশাপে পরিণত হয়েছিল। কঠোপনিষদে আছে : 'মানুষ শস্যের মতো মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আবার শস্যের মতই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।' (১ : ১ : ৬) প্রথম দিকে মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি মানুষকে শঙ্কিত করে তুলেছিল; বিশেষভাবে পুনর্জন্মরূপ এই চুড়ান্ত অভিশাপটি নাস্তিক্যবাদীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, যারা বিশ্বাস করত যে, শুধুমাত্র এই পৃথিবীই বাস্তব এবং মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। অর্থাৎ এটা ছিল সেই সময়, যখন প্রচলিত মতবাদ সম্পর্কে অবিশ্বাস খুব স্পষ্টভাবে মাথা তুলেছিল এবং তাই তাকে সর্বাধিক অকল্যাণপ্রদ যে পুনর্জন্ম তার দ্বারাই শাস্তি দিতে, হ'ল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না

করে যে ব্যক্তি মরে, পুনর্জন্ম তার নিশ্চিত ভবিতব্য এবং এরূপ ব্যক্তি মানুষ, ইতর প্রাণী কিংবা জড় পদার্থীরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে পারে (কঠ, ২ : ২ : ৭, ২ : ৩ : ৪); মুণ্ডক উপনিষদে কর্ম 'অদৃঢ় তরণী'রূপে বর্ণিত; কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্যই পুনর্জন্ম সংরক্ষিত। পরবর্তী জন্মগুলিতে কোনো ব্যক্তির অবস্থান তার আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও মর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। জীবজগতের জীবনের পুনর্নবায়ণ লক্ষ্য করে যে তৎকালীন মানুষ এই ধরনের তত্ত্বে উপনীত হয়েছিল, তার ইঙ্গিত রয়েছে—আম, বট বা পিপুল গাছের উল্লেখে (মুণ্ডক ১ : ২ : ৯)।

তবুও পুনর্জন্ম লাভের এই সম্ভাবনাকে কখনো কাম্য মনে করা হয় নি, মানবজীবনে প্রধান আশঙ্কা রূপেই তা বিবেচিত হয়েছে, যে আশঙ্কা শুধু চূড়ান্ত মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ অর্জনের দ্বারা জয় করা সম্ভব। এই মুক্তির তিনটি স্তর রয়েছেঃ পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে তা হ'ল মৌলিক ঐশ্যবোধের উপলব্ধি বা সকল বাস্তবতা যে-একে মিলিত হয়, সেই ব্রহ্মা এবং জীবাত্মার অন্তর্নিহিত সত্বার একত্ব। এভাবে ব্যষ্টি মানুষের খণ্ডিত সত্তার বোধ থেকে আসে মুক্তির সংকেত। পরলোক তত্ত্বের স্তরে উন্মোচিত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা একটি দীর্ঘস্থায়ী ফল পাওয়া যায়—তা পুনর্জন্মের শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি। তৃতীয়ত, আধ্যাত্মিক স্তরে মুক্তি হ'ল অতীত কর্মের ও কর্মফলের বিলুপ্তিকর্মের ভয়াবহ ও অমোঘ। কার্যকরণ-শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি। তৃতীয়ত, আধ্যাত্মিক স্তরে মুক্তি হ'ল অতীত কর্মের ও কর্মফলের বিলুপ্তিকর্মের ভয়াবহ ও অমোঘ। কার্যকরণ-শৃঙ্খল ও তার ফলাফলের উচ্ছেদসাধন। বিভিন্ন উপনিষদে বিশ্বে মৌলশক্তিকে বিশুদ্ধ, অমৃতস্বরূপ এবং জাগতিকতার স্পর্শরহিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জ্ঞান ও বোধই বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষকে প্রকৃত একত্ববোধের অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে—এই ভাবনা সর্বতোভাবে নতুন একটি ধর্মীয় মূল্যবোধের সূচনা করেছিল। কঠোপনিষদ মুক্তিলাভের প্রক্রিয়াকে বিশদভাবে

বর্ণনা করেছে; সেখানে বলা হয়েছে যে, আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত আদি ও অন্তহীন, ও গভীর ও অনন্ত শান্তির আধার-আত্মাকে জানার পর মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে নিস্তার পায় (১ : ৩ : ১৩, ১৫; ২ : ১ : ১; ২ : ২ : ১৩)। কখনো বা এই আত্মাকে পুরুষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে জানার ফলে মানুষ মুক্তি পায়, অমৃতত্ব ও নিত্য আনন্দের লোকে উত্তীর্ণ হয়। প্রশ্নোপনিষদে যে 'প্রাণে'র উল্লেখ আছে, তাই আত্মতত্ত্বের প্রাথমিক স্তর। মুণ্ডক উপনিষদে বিশ্বজগতের সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল শক্তিরূপে পুরুষকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়েছে; মুক্তির আনন্দময় অবস্থা এই উপনিষদে মনোজ্ঞ কাব্যিক পদ্ধতিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেও আমরা এই ভাবনার অনুবৃত্তি লক্ষ্য করি; সেখানে শিব-বিষয়ক জ্ঞান মুক্তিপ্রদ ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অভিব্যক্তিরূপে বর্ণিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধই যে মুক্তি তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে যজ্ঞের অতীন্দ্রিয় রূপক ব্যাখ্যাকে অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক বিশ্বাস ও অধ্যাত্মবিদ্যার মধ্যবতী অস্থায়ী সেতুরূপে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি প্রাচীনতর প্রত্নকথাগুলির তাৎপর্য আমূল পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে। সংহিতা যুগ থেকে উপনিষদের যুগে বিবর্তিত হওয়ার পথে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ গঠন এমন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যে দার্শনিক ভাবনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন সমস্যাসংকুল জটিলতা দেখা দিল, তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিশ্ববীক্ষায় ব্রহ্মবিদ জ্ঞানী নিজেকে ব্রহ্মা বলে উপলব্ধি করেন, পুনর্জন্মের হেতু সকল বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মরণশীল মানুষ তখন অমরত্ব ও ব্রহ্মাত লাভ করে (৪ : ৪ : ৭)। বস্তু ও মন, দেহ ও আত্মার মধ্যে বিশ্বচ্ছদের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে ভাববাদী দর্শনের প্রথম পদক্ষেপ। যদিও এটাই একমাত্র আধ্যাত্মিক পদ্ধতি নয়, তবুও একে আমরা তৎকালীন চিন্তাজগতে বিশিষ্ট একটি প্রবণতাররূপে গ্রহণ করতে পারি। অধিকতর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দর্শন-প্রস্থানের অস্তিত্ব

থাকলেও (উপনিষদে উন্দালকের ভূমিকা ও ভাবাদর্শে তার পরিচয়ও আছে) এদের অতি সামান্য নিদর্শন আমাদের হাতে পৌঁছতে পেরেছে।

শুধু যে মূল তত্ত্ব-সন্ধানের ক্ষেত্রে উপনিষদের যুগে সার্বিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তাই নয়; জীবন-সম্পর্কিত চূড়ান্ত দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও যে স্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তারই ফলে উপাসনা-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অভিনব দিক পরিবর্তন অভিব্যক্ত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল পার্থিব অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যা এই পর্যায়ে মানবজীবন অবিমিশ্র মন্দ ও দুঃখময, ও পূর্ববর্তী জন্মের পাপের শাস্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তৎকালীন সমাজে দুটি মতবাদ বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল; জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ যা পরবর্তী জন্মে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুটি মতবাদ একত্রে পার্থিব অস্তিত্বের সামগ্রিক তাৎপর্যকেই আমূল পরিবর্তিত করেছিল; উপনিষদে মানবজীবন একটি অনন্ত কার্যকরণ-শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছিল, কারণ এই জন্মের প্রত্যেকটি কাজের সমপরিমাণ ও সমানুপাতিক ফল যে পরবর্তী জন্মে ভোগ করতে হয়–এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ফলে, অস্তিত্বের দ্যোতনা অনন্ত হয়ে উঠল। উপনিষদ যুগ শুরু হওয়ার পূর্বে এবং পাবেও বহু তত্ত্বজ্ঞানী আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা কার্যকারণ নিয়মের অমোঘতা ঘোষণা করে জন্ম-শৃঙ্খলের আপাত-অবিনাশী স্বরুপকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন; মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য সম্পর্কে তিক্ত বিদুপ, নৈরাশ্যবাদ ও সংশয়ী মনোভাব এই চিন্তাধারার অধিকাংশ প্রবক্তাদের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

বস্তুত এযুগের প্রায় প্রত্যেকটি চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিপুল দ্বন্দ্বজনিত অভিঘাত দার্শনিক ভাবনার তত্ত্বের উদ্দেশ্যবাদী ও স্বরূপবাদী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তিনটি, প্রধান দার্শনিক ধারা—জৈন, সে বন্ধ ও উপনিষদীয়— এসব সমস্যার তিনটি ভিন্ন সমাধান তুলে ধরেছিল।

উপনিষদের মধ্যে প্রচলিত যজ্ঞসমূহের পুনর্বিশ্লেষণ, অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবনার উপাদান এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলিকে বিভিন্নভাবে আত্মসাৎ করে নেবার প্রবণতার ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান শত্রুপক্ষের আক্রমণ বিশেষভাবে প্রতিহত হ'ল। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ধর্মের চরিত্র অনেকাংশে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। পরিবর্তনের মধ্যেও যে নিরবচ্ছিন্ন ৩। রক্ষিত হ'ল, তারই ফলে প্রতিবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির প্রভাব অনেকাংশে বিলুপ্ত হ'ল এবং বাহ্মণ্যধর্মের নতুন রূপ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল। তবে, সাধারণভাবে জীবন নানাবিধ দুঃখ, হতাশা, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু দ্বারা আকীর্ণ হওয়ায় অমঙ্গল রূপেই পরিগণিত এবং সেজন্য তার অবসান কাম্য : এই বিশ্বাস সে যুগের সমস্ত দর্শন প্রস্থানের দ্বারা সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছিল। তবে, বৌদ্ধধর্ম যেখানে সচেতন অস্তিত্বের মৌলিক বিনাশকে ঈপ্সিত মনে করেছে, জৈনধর্ম বিশ্বজগতের শীর্ষ-বিন্দুতে উন্নীত হওয়ার জন্য কর্ম থেকে আত্মার স্বাধীন অবস্থানের তত্ত্ব প্রচার করেছে। অন্যদিকে উপনিষদগুলিতে অধিকতর ইতিবাচক লক্ষ্য স্থাপিত হয়েছে–পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একাত্মতা, যার মৌল স্বরূপ হ'ল অস্তিত্ব চৈতন্য, ও আনন্দ। তৎকালীন সাধকের কাছে সার্বিক ধ্বংসের চেয়ে এই একাত্মবোধ অধিকতর আকর্ষণীয় তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে; ব্রাহ্মণ্যধর্মের চূড়ান্ত বিজয় ও অন্যদুটি ধর্মচর্য অপেক্ষা দীর্ঘতর। পরমায়ু ও অধিক প্রাধান্য লাভের এটা একটা বড় কারণ। জীবনের পুনরাবৃত্তির শৃঙ্খল মোচন করে চৈতন্যময় আনন্দময় সত্ত্বা অর্থাৎ বিশ্বজগতের অন্তরতম আত্মার সঙ্গে সম্মিলিত হওয়াই জীবনের লক্ষ্যরূপে এতে গৃহীত হয়েছে। ঈশ, কেন ও কঠ উপনিষদে নতুন ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবনের নতুন লক্ষ্য বিশ্লেষিত হয়েছে (ঈশ ৭; কেন ৪ : ৬; কঠ ১ : ২৭ : ২৮; ১ : ২ : ২) কর্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলি এই পর্যায়ে হীনতর বলে বিবেচিত, ত্যাগ ও মুক্তি উন্নতরূপে প্রশংসিত। পূর্ববর্তী পর্যায়ের ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী যজ্ঞ, ধন-ক্রিয়া, সর্ববিধ ঐহিক সুখ, দীর্ঘ জীবন ও স্বর্গ

অর্জনের জন্য প্রযুক্ত হত। উপনিষদের পর্যায়ে স্পষ্ট ঘোষিত হ'ল যে স্বরূপকে কখনো অস্থায়ী পার্থিব বস্তুদ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয় (কাঠ ১ : ২ : ২০)। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম বোধ করাই প্রকৃত লক্ষ্যরূপে এখানে বিবেচিত হয়েছে। প্রশ্নোপণিষদের বিখ্যাত কাহিনীটিতে পিপ্পলাদ ঋষি জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণদের তপঃ ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধা আচরণের উপদেশ দিয়েছিলেন (২ : ২)। প্রাথমিক স্তরে শ্রদ্ধার চরিত্রে যেন একটি ঐন্দ্রজালিক শুদ্ধতা নিহিত ছিল, কিন্তু ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে উপনিষদে তা নৈতিক চরিত্র অর্জন করে। পিপ্পলাদের উপদেশ নতুন মূল্যবোধ এবং চরম আত্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিতবাহ। লক্ষণীয় যে, পিপ্প্যলাদের উপদেশে যজ্ঞানুষ্ঠান উল্লিখিত হয়নি, অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে অনুপযোগী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ধর্মীয় জীবনের লক্ষ্যও ভিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই দেবতারা আর পূর্বের মতো প্রাচুর্য, সুখ ও দীর্ঘজীবনের তাবৎ পার্থিব আনন্দের বিধানকর্তা নন, তারা এখন জীবন থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। এই উপনিষদে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানও বহুস্তরে বিন্যস্ত, তাই উচ্চতর উপলব্ধির জন্য একনিষ্ঠ আলোচনা ও তত্ত্বোপলব্ধি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সমাজে পুরোহিত অপেক্ষা জ্ঞানের উপদেষ্টা আচার্যের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদেও যজ্ঞকে ক্ষয়শীলরূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা কখনও অবিনাশী মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না।

মুণ্ডক উপনিষদে শৌনক আঙ্গিরাকে যে প্রশ্ন করেছেন, তাতে দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে (১ : ২ : ১-৭)। জীবনের নতুন লক্ষ্য অনুযায়ী ব্রহ্মবিদ স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে ওঠেন–দুঃখ ও পাপের সীমা অতিক্রম ক'রে তিনি আসক্তি ও অজ্ঞতার অদৃশ্য বন্ধন ছিন্ন করে অমরত্ব লাভ করেন (৩ : ২ : ৯)। অনুরূপভাবে তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে এই যুগের নূতন চিন্তাধারার চূড়ান্ত ভাবাদর্শ বিবৃত হয়েছে। শ্বেতাশ্বেতর

উপনিষদে যোগ-প্রনোদিত সংযমের মাধ্যমে ঈঙ্গিত ব্রহ্মা-সান্নিধ্য লাভের চিন্তার ফলে মায়া-মোহ দূরীভূত হয়। এই উপনিষদে দৈব অনুগ্রহ-লাভের যে প্রভাব বর্ণিত হয়েছে (৩ : ২০), তা একটি নুতন ভাবধারার সূচনা করে।

পাপ সম্পর্কে উদ্বেগ এবং পাপমোচনের আকাঙ্ক্ষা এই যুগের একটি নূতন চরিত্র-লক্ষণ, কারণ, আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রাধান্যের সময় পাপ নিতান্ত অনুষ্ঠানগত ত্রুটি-বিচূতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পাপ ও দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপর উপনিষদে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মবিদ। পাপকে জয় করেন; পাপ, ত্রিগুণ ও সংশয় থেকে মুক্ত হয়েই তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন (৪ : ৪ : ২৩)। এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা পূর্বে ব্রহ্মাণত্ব শুধু জন্ম ও আচরণ দ্বারা নির্ধারিত হ'ত; কিন্তু এই পর্যায়ে এই প্রথম ব্রহ্মাণতের নির্ণায়করূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই ধারণা ধর্মশাস্ত্রের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (১ : ৪ : ৮, ৪ : ৪ : ১২ ইত্যাদি)। ব্রহ্মবিদ বহু পার্থিব সুখ উপভোগের পর মৃত্যুর পরে ব্রহ্মো লীন হন।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪ : ৪ : ২২ অংশটি। "ব্রাহ্মণের প্রাত্যহিক স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, দান, তপঃ এবং নিষ্কামভাবে জীবনযাপনের দ্বারা, এই (ব্রহ্ম)কে লাভ করতে প্রয়াসী। এই (ব্রহ্ম)কে জেনে মানুষ মুনি হয়, সন্ন্যাসীরা এই পদপ্রাপ্তির আশায় গৃহত্যাগ করে। এই (সন্ন্যাস) এমন ছিল কারণ পূর্বকাল ব্রহ্মবিদরা বংশবিস্তার চাইতেন না, তারা মনে করতেন। আমরা যাঁরা আত্মা-কে একমাত্র লভ্যবস্তু জ্ঞান করি, বংশবিস্তারে আমাদের কী হবে?' পুত্র, ধন ও (ইহ এবং পরলোকে) উচ্চস্থানের লোভ পরিহার করে' তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন।" এখানে একটি প্রবণতা লক্ষ্য

করি (১) বেদনির্দিষ্ট জীবনধারাকে সন্ন্যাসজীবনের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা (২) ব্রাহ্মণ্যধর্মকে যজ্ঞসীমার বাইরে এনে অবৈদিক ধর্মচারকে স্বীকৃতি দেওয়া (৩) প্রাগ্বৈদিক ঋষিদের সম্পর্কে বিদ্বেষ পরিহার করে মুনির সংজ্ঞাকে বিস্তৃতিদান। আপাত-অসমঞ্জস জীবনধারাগুলিকে সামঞ্জস্যদান এই উপনিষদটির একটি উদ্দেশ্য, ধর্মাচরণের জীবনীশক্তির প্রাবল্য এতে ঘোষিত হয়। এবং এ প্রয়াস সার্থকও হয় : সাধারণ মানুষ, উৎসব সমারোহ প্রতি যাদের প্রবণতা, ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের মন আশ্রিত তাদের কাছে যজীয় অনুষ্ঠানকে রূপকে পরিবেশন করে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। তাদের বলা হল যজ্ঞকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে, তার বস্তুগত দিকটির আত্মস্থ করে, রূপকায়িত আধ্যাত্মিকতার উন্নীত করতে বলা হল। মুনিদেরও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বিপক্ষের প্রত্যাহ্বানের শাণিত শক্তিকে ক্ষীণ করে দেওয়া হল। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসকে 'আশ্রম'-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে ব্রাহ্মণ্যধর্মী জয়ী হল, তার পরমায়ু বৃদ্ধি হল। পুরাতনের সঙ্গে নুতনের সীমা নির্ণীত হল। যাজ্ঞবল্ক্যের সেই বিখ্যাত উক্তিতে, "গার্গি, সেই অক্ষয়কে না জেনে যে পৃথিবী ত্যাগ করে যে কৃপার পাত্র, তাকে জেনে যে এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করে সে-ই ব্রাহ্মণ" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩ : ৮ : ১০) ব্রাহ্মণের এই নূতন সংজ্ঞা ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে সমাজের সঞ্চিত শ্রদ্ধাকে নূতন এক তাৎপর্যেমণ্ডিত করে, চিন্তাজগতে নূতন এক দিকনির্দেশ সূচিত করে।